কিশোর ভারতী

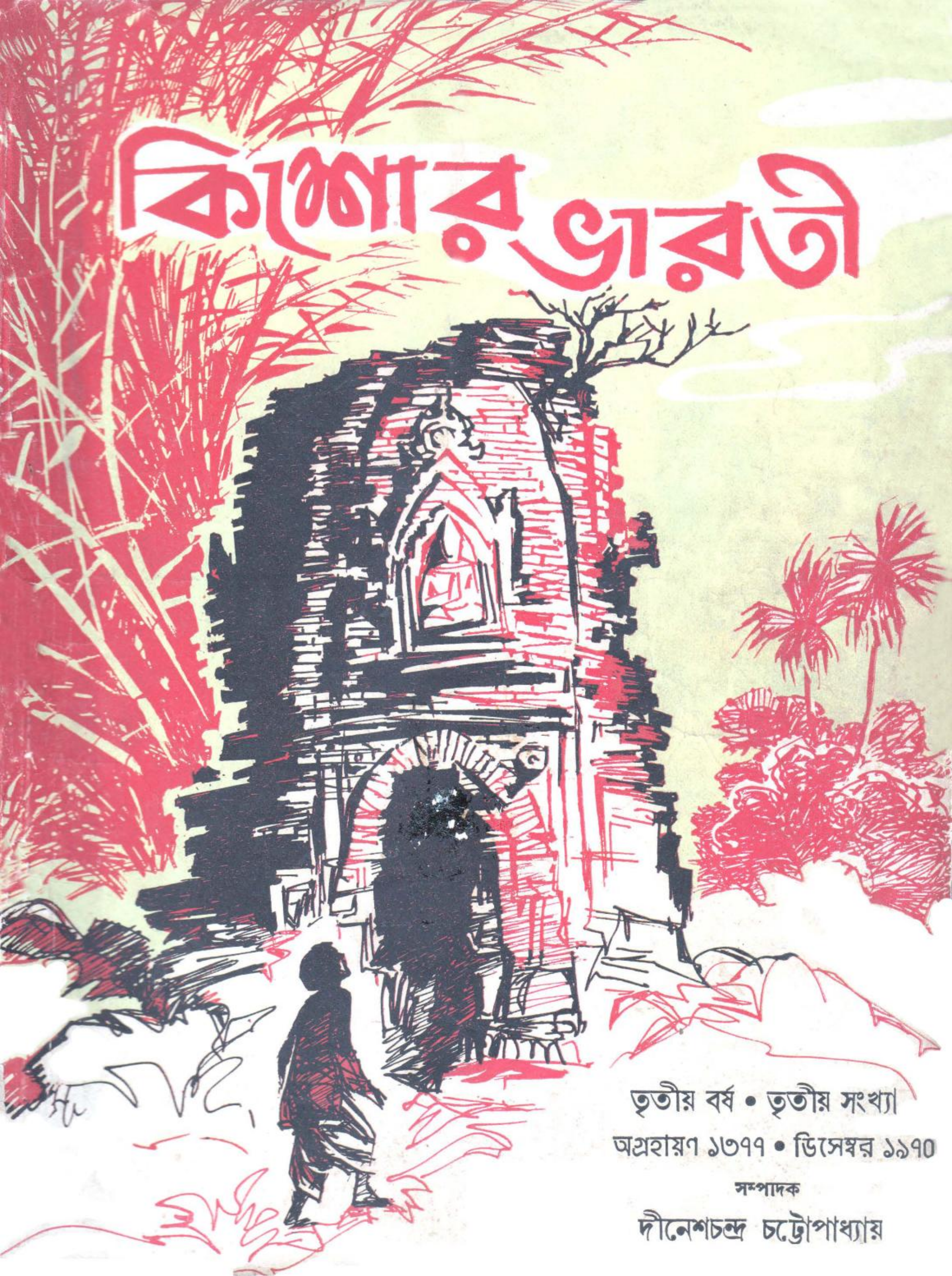

তৃতীয় বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ • ডিসেম্বর ১৯৭০

সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - স্বাগত ওয়াকার

স্ক্যান করেছেন - স্বাগত ওয়াকার

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

'কিশোর ভারতী'র গ্রাহক হবার জন্য আবেদনপত্র

সবিনয় নিবেদন,

আমি 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক হবার জন্য এই আবেদনপত্র যথাযথ পূরণ করে পাঠালাম। এজন্য প্রয়োজনীয় চাঁদা বাবদ নয় টাকা এবং একটি বিশেষ সংখ্যার রেজেস্ট্রী ডাকব্যয় বাবদ আরো এক টাকা..................................তারিখে আমি মনি-অর্ডার যোগে/নগদে পত্রিকার কার্যালয়ে জমা দিচ্ছি। আপনারা আমাকে প্রতি মাসে...........................সংখ্যা থেকে নিয়মিত পত্রিকা পাঠিয়ে বাধিত করবেন। জ্ঞাতব্য বিষয় নীচে দেওয়া হলো:

আবেদনকারীর নাম

আবেদনকারীর ঠিকানা...

পিতার/অভিভাবকের নাম

পত্রিকার যে সংখ্যা থেকে গ্রাহক হতে ইচ্ছুক...........................

তারিখ.....................   আবেদনকারীর স্বাক্ষর

• তৃতীয় বর্ষের জন্য গ্রাহক/গ্রাহিকা হবার পরিবর্তিত নিয়মাবলী •

১. বাংলা আশ্বিন বা ইংরেজী অক্টোবর মাস থেকে 'কিশোর ভারতী'র বর্ষারম্ভ। বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি বৃহৎ কলেবরে বিশেষ শারদীয়া সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়। **গ্রাহক হতে হলে বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকেই হতে হবে—যে কোন সংখ্যা থেকে নয়।** বর্ষের প্রথম বৃহৎ-কলেবর সংখ্যাটি গ্রাহক-গ্রাহিকাদের বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

২. 'কিশোর ভারতী'র গ্রাহক চাঁদার হার বার্ষিক টা. ৯·০০ (নয় টাকা)। ঐ টাকা এক-কালীন ও অগ্রিম দেয়। সাধারণ সংখ্যা পাঠাবার ডাকব্যয় গ্রাহক-গ্রাহিকাদের দিতে হয় না। তবে বর্ষের প্রথম (বিশেষ শারদীয়া) সংখ্যাটি সাধারণ ডাকের পরিবর্তে রেজেস্ট্রী ডাকে পাঠানো হয় খোয়া যাবার সম্ভাবনা এড়াবার জন্যে। **ঐ বিশেষ সংখ্যাটি ডাকযোগে পেতে হলে রেজেস্ট্রী ডাক-ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত এক টাকা গ্রাহক-গ্রাহিকাকে নয় টাকার সঙ্গেই দিতে হয়।** বিশেষ সংখ্যাটি সরাসরি কার্যালয় থেকে হাতে নিলে অবশ্য এর প্রয়োজন হয় না।

৩. চাঁদার টাকা মানি অর্ডার করে মানি অর্ডার কুপনে সম্ভাব্য গ্রাহক বা গ্রাহিকার নাম, পিতা বা অভিভাবকের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি স্পষ্ট করে লিখে কার্যালয়ে কর্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাতে হয়, অথবা (রবিবার ও ছুটির দিন বাদে) যে কোন দিন বেলা বারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে এবং শনিবার বেলা বারোটা থেকে বেলা দুটোর মধ্যে কার্যালয়ে এসে জমা দিতে হয়। নগদ টাকা জমা দিলে, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই রসিদ নিতে হবে। **গ্রাহক চাঁদা চেকে বা পোস্টাল অর্ডারে পাঠানো চলবে না।**

৪. চাঁদার টাকা জমা দেবার সঙ্গে সঙ্গে 'গ্রাহক হবার আবেদনপত্র' পূরণ করে কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। **আবেদনপত্র পূরণ করে না দিলে গ্রাহক-গ্রাহিকার পত্রিকা পেতে যথেষ্ট বিলম্ব হবার সম্ভাবনা থাকে।** এই আবেদনপত্র সাধারণতঃ 'কিশোর ভারতী'র প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই সংযোজিত থাকে। তাছাড়া কার্যালয়ে চিঠি লিখলেও প্রয়োজনমত আবেদনপত্র পাঠানো হয়।

৫. ইংরেজী আগস্ট মাসের পনের তারিখের পর থেকে অক্টোবর মাসের পনের তারিখ পর্যন্ত চাঁদা জমা নেওয়া বন্ধ থাকবে। ঐ সময়ের মধ্যে সরাসরি বা মানি অর্ডারে প্রেরিত চাঁদা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট দুই মাস বাদে বছরের অন্য যে কোন সময় চাঁদা জমা দেওয়ায় কোন বাধা নেই।

৬. 'কিশোর ভারতী' প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি বা প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথমে প্রকাশিত হয়। প্রতি ইংরেজী মাসের ১৭ তারিখের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকার সংখ্যা না পেলে, ঐ মাসের ২২ তারিখের মধ্যে **গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করে** পত্রিকা কার্যালয়ে তা জানালে পত্রিকা পুনরায় পাঠানো হয়। **যে খামের ভিতর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের কাছে পত্রিকা পাঠানো হয়, তার উপর গ্রাহক-গ্রাহিকার নামের বাঁ ধারে ইংরেজীতে যে নম্বরটি লেখা থাকে, সেটাই হল গ্রাহক-নম্বর।** গ্রাহক-গ্রাহিকারা সমস্ত চিঠিপত্রাদিতেই গ্রাহক-নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করবে।

৭. কোন গ্রাহক-গ্রাহিকা, ইচ্ছা করলে, **চাঁদা জমার রসিদ দেখিয়ে** (রবিবার ও ছুটির দিন বাদে) যে কোন দিন বেলা বারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে এবং শনিবার বেলা বারোটা থেকে বেলা দুটোর মধ্যে পত্রিকার কার্যালয়ে এসে সরাসরি পত্রিকা নিতে পারবে। সরাসরি কার্যালয় থেকে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক গ্রাহক-গ্রাহিকাকে পত্রিকার সেই সংখ্যা প্রকাশের অন্তত ১৭ দিন আগে পত্রিকার কার্যালয়ে সেই মর্মে জানাতে হবে।

৮. ঠিকানা বদল হলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্তত সেই ইংরেজী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে অথবা পত্রিকা প্রকাশের ১৭ দিন আগে গ্রাহক-গ্রাহিকাকে তা পত্রিকার কার্যালয়ে জানাতে হবে **গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করে।**

৯. একবারে এক বছরের বেশী সময়কাল গ্রাহক হওয়া যাবে না।

১০. এতৎসম্পর্কিত আর কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে, কর্মাধ্যক্ষের নামে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ

পত্র ভারতী ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ ॥ ফোন নং ঃ ৩৪-৩১৫৭ ও ৩৫-১৯৪৪

ওদের দিন ব্রিটানিয়া হরলিক্স বিস্কুট -ওরা শক্তি পাবে

বাড়তি শক্তি যোগানোর জন্যে বুদ্ধিমতী মায়েরা খেলুড়ে ও ডানপিটে ছেলেদের সব সময় ব্রিটানিয়া হরলিক্স বিস্কুট দেন। [illegible], পুষ্টিতে ভরপুর, স্বাদে লোভনীয়। ব্রিটানিয়া হরলিক্স বিস্কুট ওদের স্কুলে নিয়ে যাবার সেরা জলখাবার আর বাড়ীতে তো কথাই নেই!

ব্রিটানিয়া মানেই সেরা বিস্কুট

BBC. 1368

বিদ্যোদয়ের বই

তোমরা আমাকে গল্প-লেখক বলেই জানো। কিন্তু আমি যে একজন ভালো শিকারী, এ খবর নিশ্চয়ই তোমাদের জানা নেই। শুধু ভাল্লুকই নয়, পাঁচ-পাঁচটা জলজ্যান্ত বাঘও আমি মেরেছি। এই দুটি হর্ষবর্ধক শিকার-কাহিনীসহ 'ঘটোৎকচ বধ', 'কাষ্ঠ-কাশির চিকিৎসা' 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' ইত্যাদি আরো দশটি হাসির তুবড়িতে যে বইটি ঠাসা, আড়াই টাকা দামের সেই বইটির নাম **আমার ভাল্লুক শিকার।**

শিবরাম চক্রবর্তী

● **এই লেখকেরই আর একখানি গল্প-সংকলন** ●

চোরের পাল্লায় চকর্‌বর্‌তি [তিন টাকা]

● ছোটদের আরো কয়েকখানা গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের বই ●

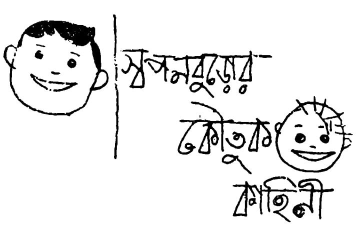

স্বপনবুড়ো ॥ ২·৮০

ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি
সমরজিৎ কর ॥ ৩·২৫

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র [সংকলন]
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ ৬·০০

অথ ভারত কথকতা
শ্রীকথকঠাকুর ॥ ৩·০০

স্বর্ণমুকুট
গোপেন্দ্র বসু ॥ ২·৫০

সুন্দরবনের চিঠি
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ ১·৬২

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯ * ফোন: ৩৪-৩১৫৭

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত [২৬. ৬. ৬৯ তারিখের টি. বি. নং ১ দ্রষ্টব্য]

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরীসমূহে ব্যবহারের জন্য ও প্রাইজ-পুস্তক হিসাবে সুপারিশকৃত। [২৫. ৯. ৬৯ তারিখের ২২/৬৯ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য]

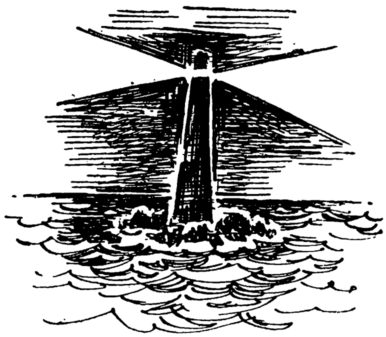

'পত্র-ভারতী'র প্রকাশনায়

কিশোর ভারতী

তৃতীয় বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ ॥ ডিসেম্বর ১৯৭০

সুচীপত্র

সম্পাদকীয়

আমাদের কথা ৩৬৯

ধারাবাহিক উপন্যাস ● মরু-গিরি-কান্তারে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের

দুরন্ত ঈগল—দীননাথ কাশ্যপ ৩৮৯

ধারাবাহিক উপন্যাস ● শিহরণজাগানো অতীত ইতিহাসের

শাণিত তীরের ফলা—ভৈরবপ্রসাদ হালদার ৪০৭

করুণ-মধুর গল্প

একটি গাছের গল্প—মণীন্দ্র দত্ত ৩৭১

অলৌকিক গল্প

দুর্যোগের রাতে—মঞ্জিল সেন ৪০২

জলা ও সাপ—চুনীলাল রায় ৪০৫

মহাজীবনের গল্পগুচ্ছ

ঘাবড়াও মাৎ !—শৈলেনকুমার দত্ত ৩৮৭

মর্মস্পর্শী সত্য কাহিনী

আন্দামানের ভয়ংকর সেই দিনগুলি—বিনয়ভূষণ চক্রবর্তী ৩৭৩

কবিতাগুচ্ছ

শেষ কদিনের রুজি—অশোক হালদার ৪০০

সবজান্তা—গোবিন্দ গোস্বামী ৪০০

চোর—স্মৃতিবিকাশ ঘোষ ৪০০

ফুল—বিমল সেন ৪০১

নাকের কথা—নচিকেতা ভরদ্বাজ ৪০১

কাঁচ ও কোমল যারা—প্রবাসজীবন চৌধুরী ৪০১

কান্না—ভূপতিকুমার দত্ত ৪০১

শিকার-কাহিনী

কালো শয়তানের অপমৃত্যু—তুষারকান্তি বসু ৩৮১

স্বাধীনতার স্বপ্ন

হত্যা করিনি, শত্রু বধ করেছি—সাগ্নিক ৪১২

জীবজগতের গল্প
জল-জঙ্গলের খেলাধুলো—নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য ৪১৪
অতীতের পাতা থেকে
ইতিহাসের দিনলিপি—মহাকাল রায় ৪১৬
গ্রাহক-গ্রাহিকার আসর—পরিচালক ঃ আনন্দ বর্ধন
একরাশ চিন্তার মৃত্যু (গল্প)—দিলীপ রায় ৪২০
এসেছে আনন্দ-ঋতু (কবিতা)—প্রসূনকমল ভট্টাচার্য ৪২১
ছড়া—রাধারঞ্জন হালদার ৪২১
লিমেরিক—তপনজ্যোতি মিত্র ৪২১
নতুন মামা (গল্প)—ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪২২
ঝগড়া (কবিতা)—বিশ্বজিৎ বসাক ৪২২
ধাঁধা-হেঁয়ালি—পরিচালক ঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
নতুন ধাঁধা ৪২৩
গত মাসের শব্দ-হেঁয়ালির উত্তর ও নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম ৪২৩
বিজ্ঞানীর দপ্তর—পরিচালক ঃ কিশোর বিজ্ঞানী
নিজে করো ঃ ম্যাজিক ডিম—অণুবীক্ষণ সমাদ্দার ৪২৫
বিজ্ঞান-বিচিত্রা—অণুবীক্ষণ সমাদ্দার ৪২৫
রূপ-রঙ্গ ঃ ঘোষক
চলচ্চিত্রে বিপ্লব ঃ ইঞ্জিনীয়ার থেকে চলচ্চিত্রকর ৪২৬
আমিই আমার অভিভাবক ৪২৮
খেলাধুলা ঃ শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
শরীরটাকে সুস্থ রাখো ৪২৯
হুক ও পুল ৪৩০
খেলার আসর ৪৩১
মনে রাখার মতো ঘটনা ৪৩২
সওয়াল-জবাব ঃ বাণী মৌলিক
প্রশ্নোত্তর-বিভাগ ৪৩৩
সংবাদ-বিচিত্রা
খুনী রোবট্—সুভাষ নাগ ৩৮৬
ভেনজুয়ালা ঘাস—সতীরঞ্জন আদক ৪২৪
গল্পের যাদুঘরে
অম্লমধুর—অভিজিৎ গুহ ৪০৪
টুকরো হাসি
একটু হাসো!—সৈয়দ সুশোভন রফি ৪২৪
চিত্রে ধারাবাহিক উপন্যাস ● উদ্ভট হাস্যের
কুম্ভীর-বিভ্রাট—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও শৈল চক্রবর্তী ৩৭২
চিত্রে ধারাবাহিক উপন্যাস ● জমাট রহস্যের
রহস্যময় সেই বাড়িটা—দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ও নারায়ণ দেবনাথ ৩৮৮
চিত্রে যুগল-মূর্তির বিচিত্র সরস কাহিনী
নন্টে আর ফন্টে—নারায়ণ দেবনাথ ৪১৪
প্রচ্ছদ-সমীক্ষা
গত মাসের ও এ মাসের—সূর্য রায় ৩৮০

মূল্য ঃ পচাঁত্তর পয়সা

'পত্র-ভারতী'র পক্ষে দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

আমাদের কথা

স্নেহের বন্ধুগণ,—শীত এসেছে। বাংলা দেশে শীত-ঋতু চিরদিনই আনন্দ ও খুশির আমেজ বয়ে আনে। কিন্তু আজ কোথায় তা ? বাংলার আজ বড় দুঃসময়—বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলার। ভয়ংকর প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝঞ্ঝায় সবকিছুই আজ প্রায় বিপর্যস্ত, শিক্ষাব্যবস্থা ধসে পড়ার মুখে। ভয়াবহ সংকটের আবর্তে সব যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

ভাঙন আর ভাঙন। দেশের কৃষিব্যবস্থায়, শিল্প-কারবারে, শিক্ষাব্যবস্থায়, সমাজে সংসারে, সর্বত্র ভাঙন। দেশময় বেকারি, ব্যবসাপত্রে অচলাবস্থা, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে হুহু করে, লেখাপড়া বন্ধ। আর তারই মধ্যে নিত্য চলেছে নিদারুণ খুনখারাবি, রক্তারক্তি, নিপীড়ন। দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায় এ আবহাওয়ায়। নৈরাশ্য, অনিশ্চয়তা-বোধ ও অরাজকতার গাঢ় অন্ধকার আজ জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসছে দেশের বুকের ওপর।

দেশের বহু এলাকায় শিক্ষায়তনগুলি হয় বন্ধ, না হয় বন্ধ হবার মুখে। বাৎসরিক পরীক্ষা ও টেস্ট পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। কোন কোন স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছে বটে, কিন্তু সুস্থ পরিবেশে নয়।

শ্বাসরোধকারী এই অবস্থার মধ্যে তোমাদের দিন কাটছে। বয়সে তোমরা কিশোর তরুণ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব তোমাদের ওপর পড়া খুবই স্বাভাবিক। এ অবস্থা থেকে বাঁচার পথ কোথায় ?—এ প্রশ্নে তোমাদের মনও আজ তাই তোলপাড়।

কিন্তু কোথায় পথ ? কে দেবে পথের সন্ধান ? নেতারা আজ খেয়োখেয়িতে ব্যস্ত আর মানুষকে দিচ্ছেন উপদেশের পর উপদেশ। তাই পথ খুঁজে বের করতে হবে তোমাদেরই।

যে কথাটা আজ সবচেয়ে বড় সত্য, তা হলো—বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা যত দিন বজায় থাকবে, তত দিন দেশের মানুষের নিষ্কৃতি নেই, বরং দুর্যোগের অন্ধকার আরো গাঢ় হবে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে শাসন-ক্ষমতায় যে হস্তান্তর ঘটেছিল, তারপর দীর্ঘ তেইশ বছর পার হতে চললো। ভূমিব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা তখনই দেশের সামনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, এই দীর্ঘ তেইশ বছরে তার কোনটারই মৌলিক সমাধান করা হয় নি, ধামাচাপা দেবার চেষ্টা হয়েছে শুধু। তার ফলে সমস্যাগুলি জটিল থেকে জটিলতর হতে হতে চরম আকার ধারণ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে এই ভয়ংকর বিপর্যয়সৃষ্টিকারী সংকট।

কিন্তু আজও কি নেতা ও কর্ণধারদের চৈতন্যোদয় ঘটেছে ? এখনো কি তাঁরা সংকটের মূলে গিয়ে তার সুষ্ঠু সমাধান করতে প্রস্তুত ? মনে হয় না। তাহলে তাঁরা বুঝতেন, গুরুতর সংকট আজ দেশে যে ভয়াবহ বেকারি ও অভাব-অনটন সৃষ্টি করেছে, তার ফলেই দেখা দিয়েছে এই অরাজকতা ও খুনখারাবি। আর তাহলে তাঁরা ঝুড়িঝুড়ি উপদেশ ও শাসানির পথ ত্যাগ করে সংকটমোচনের কাজে আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করতেন।

সুতরাং বুঝতে পারছো বন্ধু, এ অবস্থায় দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তোমাদেরই ওপর। আগেও বলেছি, আজো বলছি, তোমরাই আগামী দিনের নেতা ও কর্মী। এটা কোন কথার কথা নয়, স্তোকবাক্যও নয়। দেশকে ও দেশের মানুষকে তোমরা ভালবাস। তাই দেশকে বাঁচানোর ও নতুন করে গড়ে তোলার নির্ভুল খাঁটী পথ তোমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য অনেক কিছু জানতে হবে ও বুঝতে হবে তোমাদের, অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করতে হবে—নিজেদের তৈরি করতে হবে আগামী দিনের জন্য। এ সম্বন্ধে 'আমাদের কথা'য় ও সুজন-

বন্ধুর বৈঠক 'খোলামনের মেলাতে' বহুবার বিশদ আলোচনা হয়েছে। সাময়িক উত্তেজনার শিকার না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে সবকিছু জেনে বুঝে সঠিক পথ খুঁজে বের করা ও সেই পথে চলা—এটাই আজ এই অসুস্থ অস্বাভাবিক পরিবেশে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

গত ১২ই ও ১৩ই নভেম্বর পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে যে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ও সর্বগ্রাসী সামুদ্রিক প্লাবন ঘটে গেছে, তার খবর তোমরা সংবাদপত্র মারফৎ জেনেছ, আশা করি। এর ফলে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে দক্ষিণ উপকূলের নিকট ঘনবসতিপূর্ণ কয়েকটি দ্বীপে জীবনের চিহ্ন প্রায় মুছে গেছে। বেসরকারী মতে, এই অশ্রুতপূর্ব ঝঞ্ঝা ও প্লাবনে পূর্ব-বাংলায় চোদ্দ-পনের লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে আর গৃহপালিত গবাদি পশু যে কত ধ্বংস হয়েছে, তার লেখাজোখা নেই। ইতিহাসে এত ব্যাপক ও এরকম শোচনীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জীবনহানির নজীর আর নেই। পূর্ববাংলার শোকাকুল ভাইবোনদের এই নিদারুণ বিপদে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাই। তাদের এ মর্মান্তিক শোকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই।

আজ আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, মহাকাশ-বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। কিছুকাল আগেও যা ছিল শুধু কল্পনায়, আজ তা বাস্তব সত্য। চাঁদের বুকে স্বয়ংক্রিয় এক যন্ত্রযান চলছে। তাকে চালানোর জন্য কোন মানুষ চালক নেই, যন্ত্রই সবকিছু করছে। সে নিজে নিজে চলছে, প্রয়োজন মতো থামছে, চাঁদের ফোটো নিচ্ছে, মাটি, পাথর ইত্যাদি পরীক্ষা করছে, আরো নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে আর সেসবই অনুগত ভৃত্যের মতো পাঠিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীতে তাকে যারা সৃষ্টি করেছেন, সেই সব সোভিয়েট বিজ্ঞানীর কাছে। এই যন্ত্রযানটির নাম লুনোখোদ-১। গত ১৭ই নভেম্বর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র চাঁদের মাটিতে নামিয়েছে বিশ্বের সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রযান এই লুনোখোদ-১কে। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে চাঁদের বুকে অদৃশ্য এই চান্দ্রযানটিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা হচ্ছে পৃথিবীর বুকে অবস্থিত মহাশূন্য যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে। সর্বপ্রকার কাজকর্ম সে অক্ষরে অক্ষরে করে চলেছে এই পরিচালন-কেন্দ্রের নির্দেশ মতো। ভাবতে পার ব্যাপারটা? তোমাদের হয়তো মনে আছে, এর আগে গত সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র চাঁদে লুনা-১৬কে পাঠিয়েছিল। লুনা-১৬ও স্বয়ংক্রিয় ও স্বনিয়ন্ত্রিত। চাঁদের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সে মানুষের মতোই ব্যাগে ভর্তি করে নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছিল নিরাপদে। তাজ্জব কাণ্ড বটে!

গত মাসের আর একটি নিদারুণ শোক-সংবাদ। গত ২১শে নভেম্বর মহান বিজ্ঞানী ডঃ সি. ভি. রামন পরলোক গমন করেছেন। কিশোর ভারতীর গত সংখ্যায় 'ইতিহাসের দিন-লিপি'তে ডঃ রামনের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হয়েছে। ওটা পড়লে বুঝতে পারবে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ আমাদের কি অপূরণীয় ক্ষতি হলো। আলো সম্পর্কে ডঃ রামনের যুগান্তকারী গবেষণা 'রামন রশ্মি' নামে খ্যাত এবং তাতেই তিনি নোবেল পুরস্কার পান। রামন রশ্মি ছাড়াও ফুলের রঙ, মানুষের শ্রবণযন্ত্র, চোখের কাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহু মৌলিক তত্ত্বের উদ্ভাবক। ডঃ রামন ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-প্রতিভা।

অনেক বন্ধু আমাদের ঈদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিয়েছে। খুশির এই ঈদ পরবে আমরাও তাদের ও অন্য সবাইকে জানাই আমাদের বুকভরা শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

আজ এই পর্যন্ত। তোমরা সবাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা গ্রহণ করো। বাংলার পূবে ও পশ্চিমে আবার সুদিন ফিরে আসুক, এই প্রার্থনা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

তোমাদের চিরশুভার্থী

সম্পাদক বন্ধু

একটি গাছের গল্প

মণীন্দ্র দত্ত

তিন কুলে আর কেউ কোথাও নেই। শুধু বুড়ি আর তার নাতি শংকর।

বুড়ির অল্প কিছু ধান-জমি আছে। ছোটখাটো একটা বাগান আছে। ঠিক পুকুর না হলেও একটা ডোবাও আছে বাড়ির পিছনে। তাতে সারা বছরই জল থাকে। তাতেই হিঞ্চে-কল্‌মি শাক যেমন থাকে বারো মাস, তেমনি থাকে পুকুরপাড়ে কচুগাছ আর পুকুরের জলে ছোট-বড় মাছ।

কষ্টেসৃষ্টে দুটো মানুষের ওতেই কোন রকমে চলে যায়। নাতিকে নিয়ে বুড়ি সুখেই দিন কাটায়।

রান্নাঘরের পিছনে একটা জামগাছ। এই সেদিনও এতটুকু চারা গাছটি ছিল। শংকরেরই সমবয়সী প্রায় গাছটা। দেখতে দেখতে ডালপালা মেলে কত বড়টি হয়ে উঠেছে! পশ্চিম আকাশটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে।

শীতের বিকেলে উঠোনের পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে বুড়ি সংসারের টুকিটাকি কাজগুলো সারতো। সে রোদের দফা এবার গয়া। জামগাছের ডালপালায় রোদের মুখ একেবারেই বুঝি ঢেকে গেছে।

একদিন বুড়ি রেগে মেগে বলল, নাঃ, এ পোড়া জামগাছ আমি কাটিয়েই ফেলব! বুড়ো হাড়ে একটু রোদ লাগাব, তাতেও বাদ সাধ্‌ল যে।

কিন্তু জামগাছ কাটা হল না। বাধা দিল শংকর। বলল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদু, ও জামগাছটা তুমি কেট না। জ্যষ্টি মাসে কত যে জাম হয় ওর ডালে ডালে, কেমন কালো-কালো, আর কী মিষ্টি! একটা মুখে দিলেই মন একেবারে ভরে যায় দিদু। বিশ্বাস না হয় তুমি দেখোই না একটা মুখে দিয়ে।

নাতির আবদার। অতএব বুড়ির গাছ কাটানো আর হল না। জামগাছটা আকাশের দিকে ডালপালা মেলেই চলল।

জ্যষ্টি মাসেই অঘটন ঘটল।

সারা দিন টুপটাপ জাম পড়ছে গাছতলায়। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে শংকর সেই জাম কুড়োয় আর মুখে ফেলে। খায় আর হল্লা করে। জামগাছ তলায় ছেলেমহলের আসর সরগরম।

বুড়ি রান্নাঘরে বসে সেই কলরব শোনে আর মনে মনে বলেঃ আহা, ভাগ্যিস্‌ গাছটা তখন কাটাই নি! নইলে এমন সাত রাখালের মেলা আমার গাছতলায় বসত কেমন করে!

একদিন ও-পাড়া থেকে একদল বড় বড় ছেলে এল বুড়ির গাছের জাম খেতে।

উঠোনে পা দিয়েই তারা হাঁক দিল, কই গো খুড়িমা, দুটো জাম খেতে এলাম তোমাদের গাছের। শংকরের কাছে শুনলাম, গাছের জাম নাকি ভারী মিষ্টি হয়েছে গো।

বুড়ি দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, তা বাবারা, খাবে খাও দুটি জাম। তবে গাছ একেবারে সাবাড় করো না। ছোট ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে কিছু রেখে যেয়ো।

ছেলেরা হেসে বলল, আরে না না, সে ভয় করো না খুড়িমা, এক গাছ জাম কি আর এক বেলাতেই খেয়ে শেষ করতে পারে মানুষে। ও অনেক থাকবে গাছে।

গাছের গুঁড়ি থেকে প্রথম ডালটা অনেক উঁচুতে। তাই গাছে উঠবার সুবিধার জন্য একটা গাঁট-ওয়ালা লম্বা বাঁশ এনে জামগাছের সঙ্গে ঠেকিয়ে বাঁধলো ছেলেরা। তারপর সেই বাঁশের গাঁটে-গাঁটে পা দিয়ে সোজা উঠে

গেল গাছের আগডালে। প্রাণভরে জাম খেয়ে জিব একেবারে ভারি করে তবে নামল গাছ থেকে।

রান্নাঘরের পাশে দাঁড়িয়ে শংকর হাঁ করে তাকিয়ে দেখল ওদের জাম খাওয়ার ঘটা।

ইস্, কি পাকা-পাকা টুস্‌টুসে জামগুলোই না ওরা মুখে পুরছে টপাটপ! গাছতলা থেকে কুড়িয়ে কি আর অমন নিটোল জাম পাওয়া যায় কখনও! হয় বাদুড়ে-খাওয়া, নয়তো আধ-পচা, নয়তো বা মাটিতে পড়ে ফেটে-যাওয়া।

আহা! শংকর যদি ওদের মত গাছের মগডালে উঠতে পারত, তাহলে কী মজা করেই না জাম খেতে পারত, মনের সাধ মিটিয়ে!

এই ভাবনাই বুঝি কাল হল। ঘটল অঘটন।

দুপুর গড়িয়ে এসেছে। বাইরে তখন টা-টা রোদ্দুর। বারান্দার মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে বুড়ি তখনও দিবা-নিদ্রায় মগ্ন।

এই তো সুযোগ।

পায়ে-পায়ে শংকর এগিয়ে গেল জামগাছতলায়। মাটিতে ছড়িয়ে-পড়া জামগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না। সোজা গাছের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। চোখ তুলে একবার তাকাল উপরের দিকে। তারপর বেঁধে-রাখা বাঁশের গাঁটে গাঁটে পা দিয়ে উঠে গেল জামগাছের আগডালে।

আঃ! রূপকথার রাজপুরী যেন। থরে থরে কতো যে নিটোল-নিটোল কালজাম সাজানো ডালে ডালে!

মনের আনন্দে একটা জাম ছিঁড়ে মুখে পুরল শংকর।

আচমকা একটা শব্দ হল।

তারপরই একটা আর্ত চীৎকার।

ঘুম ভেঙে গেল বুড়ির। ধড়াস করে উঠল বুকের ভিতরটা।

'কী হল কী হল' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বুড়ি উঠোনে নামল পড়ি-কি-মরি করে। শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল জামতলায়।

ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে।

জামগাছতলায় উপুড় হয়ে পড়ে গোঙাচ্ছে শংকর। চারদিককার মাটি রক্তে ভিজে গেছে।

ওরে আমার কী সব্বনাশ হল রে!—বলে বুড়ি উপুড় হয়ে পড়ে শংকরের রক্তাক্ত দেহটাকে জড়িয়ে ধরল।

চার-পাঁচ দিন পরে।

বিকেলে দাওয়ায় বসে আছে বুড়ি। দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে অবিশ্রাম। বুকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। শংকর নেই,—বুক হু-হু করছে।

হঠাৎ এক সময় জামগাছটার দিকে চোখ পড়তেই বুকের ভিতরটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠল।

রাক্ষুসে জামগাছ! সব্বনেশে জামগাছ! ওই রাক্ষস তার শংকরকে খেয়েছে। কালো কালো জামের লোভ দেখিয়ে না জানি আরও কত ছেলেকে ও খাবে!

নাঃ, আর একদিনও দেরি নয়! কালই ও জাম-গাছ সে কাটিয়ে ফেলবে।

একটু দূরেই 'করাতী'দের বাড়ি। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে বুড়ি সব ব্যবস্থা করে এল। পরের দিন সকালে এসেই তারা গাছটা কেটে নিয়ে যাবে।

দিন গেল। রাত হল। চোখের জল ফেলতে ফেলতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল বুড়ি।

হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল তার। কচিকচি ফিসফিস গলার আওয়াজ কানে আসছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বুড়ি বুঝল, ভোর হয়ে এসেছে।

বুড়ি সাগ্রহে কান পাতল।

—এই জামটা কী নিটোল রে!

—এই আর একটা পেলাম রে!

—ওয়াক্ থু, এটা একেবারে পচা রে!

—আস্তে কথা বল্ মিন্টু। দিদু শুনতে পেলে আবার তেড়ে আসবে।

—সত্যি রে, শংকরটা মরে গিয়ে না দিদু যেন কেমন তিরিক্ষে হয়ে গেছে।

কান পেতে কথাগুলো শুনল বুড়ি। শুনল আর ভাবল। ভাবতে ভাবতে এক সময় বুকের ভিতরটা নতুন করে হু-হু করে উঠল। দুই চোখে নামল জলের ধারা।

পাশ ফিরে অসাড় হয়ে পড়ে রইল বুড়ি। বিছানা ছেড়ে উঠল না।

জামগাছতলায় কচি গলার ফিস ফিস কথা চলতেই থাকল।

খানিক বেলা হলে 'করাতী'রা এল করাত-কুড়ুল নিয়ে। গাছটা কেটে নিয়ে যাবে।

বাধা দিল বুড়ি। গাছটা সে কাটাবে না। যেমন দাঁড়িয়ে আছে আকাশটাকে ঢেকে, তেমনি থাক।

গাছটা কাটিয়ে ফেললে তার বাড়িতে সাত রাখালের মেলা বসবে কেমন করে! ওরা যে তার শংকরেরই খেলার সাথী!

কুম্ভীর-বিভ্রাট • ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় • চিত্ররূপ • শৈল চক্রবর্তী

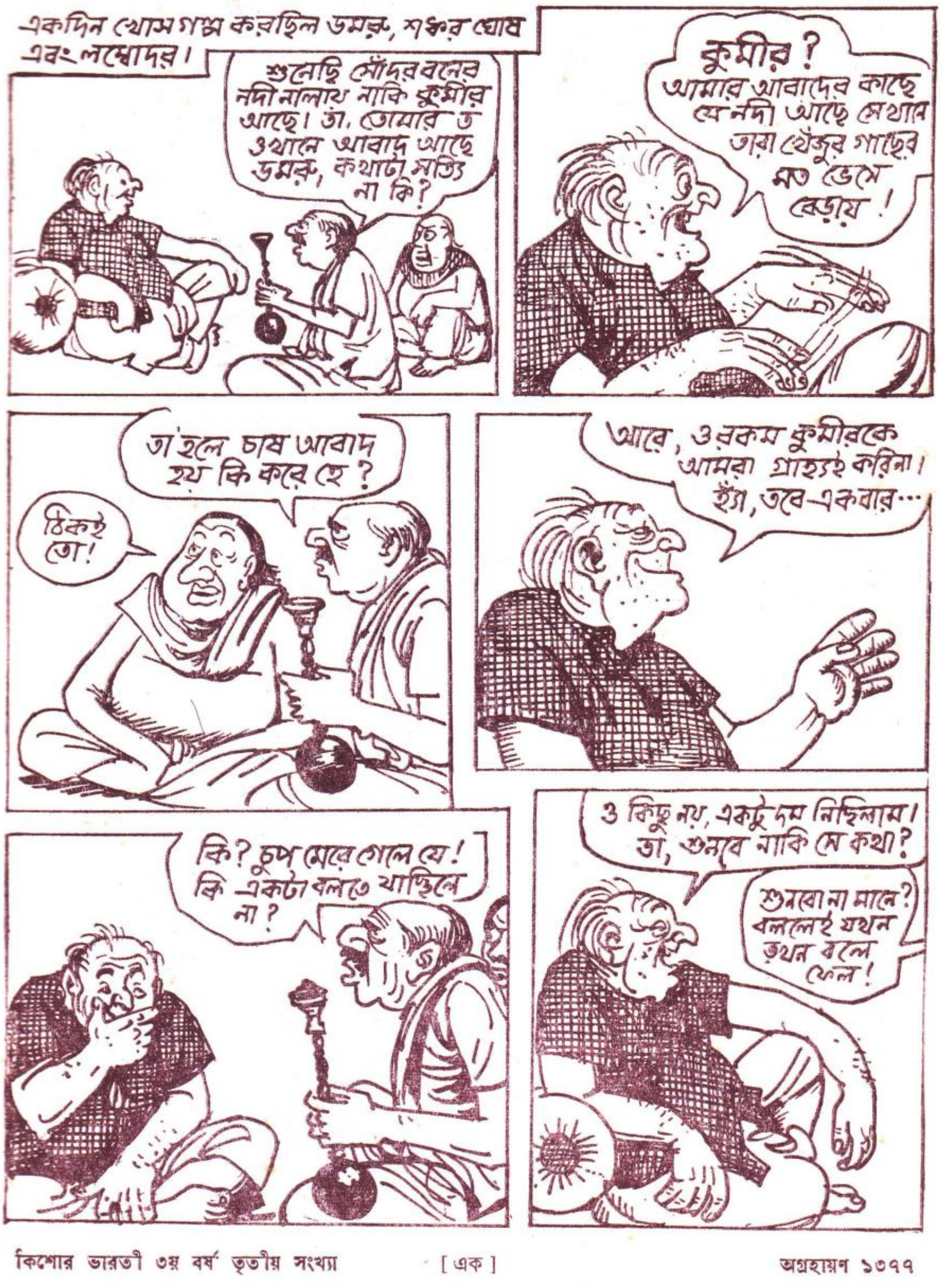

তাহলে বলি, আরে, সে একটা কুমীর বটে! গন্ধমাদন পর্বতে কালনিমের পুকুরে যে কুমীর হনুমানকে ধরেছিল — এ তার চেয়েও ভয়ানক!
বল কি?
তবে আর বলছি কি! আরে, সেই গজ কচ্ছপের যুদ্ধ হয়েছিল মনে আছে? সেই পাহাড়ের মত গজ কচ্ছপ — এর কাছে সে নস্যি!
অ্যাঁ!
এ কুমীর আস্ত গরু মোষ গিলে খেত — বুঝলে! নদীর ধারে গরু মোষ না পেলে করত কি জানো?
কি করত?
শোনো, ল্যাজে করে জল এনে দেয়াল ভিজিয়ে গর্ত করত — তারপর সিঁদ কেটে গোয়াল থেকে গরু মোষ টেনে নিয়ে যেত!
এ তোমার গালগপ্পো ডমরু। আচ্ছা, তাহলে নদীতে নৌকো যেতো কেমন করে?
নৌকো! আরে, নৌকো দেখলেই তাকে উল্টে দিত। আর যাত্রীদের তখন টপাটপ — বুঝলে?
একদিনের কথা তবে বলি — আমি নিজে আছি তীরে দাঁড়িয়ে, এক নৌকোয় কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক আসছে — সঙ্গে গৃহিনী। গৃহিনীর গায়ে ভারী ভারী দামী দামী সব গয়না —
১

[চলবে]

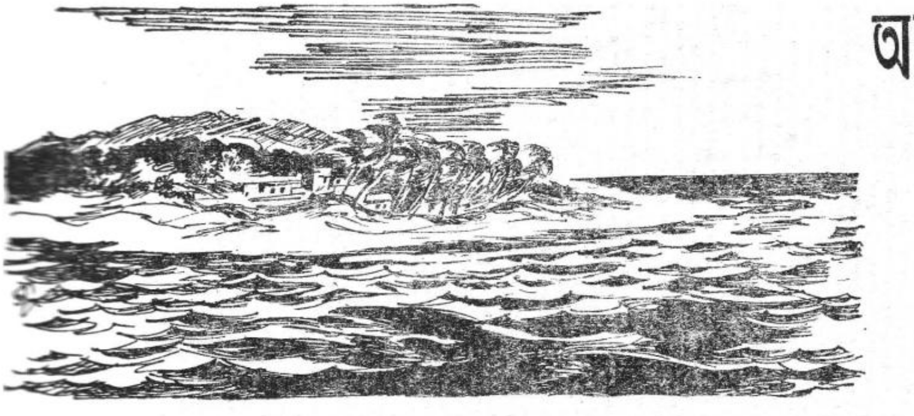

আন্দামানের ভয়ঙ্কর সেই দিনগুলি

• বিনয়ভূষণ চক্রবর্তী •

হীরালাল বাবু আজও এখানকার গভর্ণমেন্ট মিড্‌ল স্কুলের শিক্ষক। তাঁদের সাবেক বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। তাঁর বাবা প্রায় সত্তর বছর আগে এসে এখানেই বসতি করেন। হীরালাল বাবু উর্দু আর অঙ্কে খুবই নাম-করা শিক্ষক। অতি সুন্দর, সরল অমায়িক তাঁর ব্যবহার। আদর্শ চরিত্রের জন্যে সকলেরই প্রিয়পাত্র। এঁদের পদবী সরকার, কিন্তু এখানকার বাসিন্দা বাঙ্গালীরা প্রায়ই দু-এক পুরুষের ভিতর নিজেদের পদবী বেঙ্গাচির লেজের মত ছেটে ফেলে দেন। ইনিও তাই নিজের নাম বলেন শুধু হীরালাল।

যে সব বাঙ্গালী হালে এখানে পুনর্বসতি পেয়েছেন, তাঁরা কিন্তু এ সম্বন্ধে খুবই সজাগ। শুধু নিজেদের নামের বেলাতেই নয়, নিজেদের গ্রামের নাম পর্যন্ত তাঁরা পালটে দিচ্ছেন। বর্মী নাম সৌলদারী মংলুটন পালটে রেখেছেন অরবিন্দ নগর ও নেতাজী নগর। সাহেবী নাম হারবার্টাবাদ বদলে নতুন নাম দিয়েছেন সুভাষ-নগর। এ হয়েছে দক্ষিণ আন্দামানে। আর উত্তর ও মধ্য আন্দামানে তো কথাই নেই—সেখানে বাঙ্গালীরাই নতুন বসতি করেছেন। তাই তাঁদের গ্রামের নামও বাঙ্গালী। যেমন কালীঘাট, উত্তরা, শবরী, পঞ্চবটী ইত্যাদি।

আজকাল আন্দামান ভারতের একটা প্রদেশ। এর আইনকানুন সবই অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে প্রায় এক। যা কিছু একটু আধটু পার্থক্য এখনও আছে, তাও বদল করা হচ্ছে।

কিন্তু যখন জাপানীরা এসে হঠাৎ এ দেশটা দখল করে বসলো, তখন রাতারাতি সব কিছুই পালটে গেল। ইংরেজরা এদেশ শাসন করতো লাঠির জোরে। কারণ বাসিন্দারা প্রায় সবাই ছিল হয় দুর্দান্ত কয়েদী, নয়তো কয়েদীদের বংশধর। তারা লাঠি ছাড়া অন্য কোন আইনই মানতে চাইত না। কিন্তু জাপানী আমলে তারাও ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছে।

জাপানীরা ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত প্রায় তিন বছর সাত মাস আন্দামান দখল করে ছিল। প্রথম প্রথম তারা এদেশী লোকদের উপর বিশেষ অত্যাচার করেনি। ইংরেজদের উচ্চপদের দু-চারজন বিশিষ্ট কর্মচারী ছাড়া সাধারণ লোক প্রত্যক্ষভাবে বিরুদ্ধাচরণ কিংবা চুরি, লুঠ না করলে, জাপানীরা তাদের ফসলের উপর ভাগ উসুল করা বা জোর করে পরিশ্রমের কাজ করান ছাড়া আর কোন রকম অত্যাচার করতো না!

এ সময় যাদের নিজেদের চাষের জমি ছিল না, তারা আর শহরের বাসিন্দারাই খাবারের অভাবে সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছে। চাষীরাও চিনি, তেল চোখে দেখত পেত না। সেইজন্যে লোকে সুযোগ পেলেই খাবার জিনিস চুরি করতো। জাপানীরাও চোর ধরতে পারলে অমানুষিক সাজা দিত। চিনি চুরি করে সামসু কেমন সাজা পেয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। তার বরাত ভাল, তাই প্রাণ নিয়ে ছাড়া পেয়েছিল। কিন্তু অনেকের সে কপাল হয় নি। তা বাদে জাপানীদের সাজাও ছিল নিত্যনতুন ধরনের। এ বিষয়ে তারা যে বেশ মাথা খাটাতো, তা অস্বীকার করা যায় না।

খানু নামে একটা লোক চাল চুরি করে ধরা পড়ে জাপানীদের হাতে। এবার্ডিন শহরের লাগোয়া চা-বাগিচা বলে একটা পাড়ার তিন রাস্তার মোড়ের উপর

তাকে আনা হলো। সেখানে একটা গাছের ডালে খানুর পা বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। হাত পিঠ-মোড়া দিয়ে বাঁধা। সেই অবস্থায় ঠিক তার মাথার নিচেয় মাটিতে জাপানীরা কতকগুলো কাঠ সাজিয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। তার ফলে তার মাথায় আগুনের ছোঁয়া না লাগলেও পুরো তাপ আর ধোঁয়া মাথায় মুখে লাগতে থাকে। আগুন কমে গেলে আবার নতুন কাঠ চাপান হয়। এই যন্ত্রণা দু-তিন ঘন্টা ধরে ভোগ করলো লোকটা, তারপর মরে শান্তি পেল। যেতে আসতে কত লোক এই বীভৎস দৃশ্য দেখলো। কিন্তু টুঁশব্দ করার সাহস কারও হলো না, পাছে তাকেও গাছে লটকিয়ে দেওয়া হয়!

হীরালাল বাবুদের গ্রামের রামফল সেবার চিনি চুরি করে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। সংগে সংগে কাজির বিচার! সাজাও নতুন কায়দার। একটা খুঁটির সংগে জাপানীরা তার হাত-পা তামার তার দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিল। কাছেই একটা ব্যারাকে জনা চল্লিশ জাপানী নৌ সেনা থাকে। সরকারী হুকুমে তারা একজনের পর একজন এসে, একটা মোটা ডাণ্ডা দিয়ে ইচ্ছে মতো রামফলকে পিটিয়ে চললো। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে চললো এই ধোলাই-পর্ব।

তার পর যখন তাকে খুঁটি থেকে খুলে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হলো, তখন তাকে মানুষ বলে চেনাই মুশকিল। লাঠির ঘায়ে সারা গা ফেটে ফেটে রক্ত বার হয়েছে, নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে, শরীর ফুলে ঢোল।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, এত মার খেয়েও লোকটা মরে নি! তখনও প্রাণটা ধুক ধুক করছে। কর্তাদের অসীম দয়া, তাঁরা রামফলের ছেলেদের ডেকে বাপকে বাড়ি নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন! হীরালালবাবু আর অন্য গ্রামবাসীরা গরম জলের সেঁক দিয়ে, গরম তেল মালিশ করে তার শুশ্রূষা করলেন। বেচারা দশদিন পরে মারা গেল।

কিছুকাল পরেই দেখা গেল, জাপানীদের মতিগতি পালটে গেছে।

তাদের সবচেয়ে নৃশংস অত্যাচারের নাম ছিল রাউন্ড আপ (round up)। কথাটার মানে, চারদিক থেকে তাড়া করে এক জায়গায় জড়ো করা। এ কাজে জাপানীরা ছিল দারুণ পোক্ত। এবার্ডিনের এক-একটা পাড়া ঘেরাও করে তারা এক-এক শ্রেণীর লোকদের ধরে ক্যাম্পে এনে জমা করতে শুরু করলো।

দেশে তখন খাদ্য-সমস্যা চরমে উঠেছে। লোকে কচুর ডগা, পাতা তো খাচ্ছেই, তা ছাড়া সুপুরি, বেত, গাছের মাথিও বাদ দিচ্ছে না। গাছের মাথার ভিতরে কলার থোড়ের মত নরম জিনিসটাকে মাথি বলে। এটাই তখন অন্যতম সুখাদ্য হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া ছিল আরও একটা দুষ্প্রাপ্য খাবার। সেটা হচ্ছে ধানের পচা তুষ-কুঁড়ো!

জাপানীরা আন্দামান দখল করার আগে, এখানকার অ-চাষী লোকদের খাবার সরবরাহের ভার ছিল ইংরেজ সরকারের উপর। এজন্যে তাদের সাপ্লাই ডিপার্ট-মেন্ট ছিল। তারই মারফৎ তারা ধান, গম এনে এখানে পেষাই করে লোকদের কাছে বিক্রি করতো। তার ঝড়তি-পড়তি তুষ-কুঁড়ো জমে জমে উঁচু হয়ে পড়ে ছিল মেশিনঘরের একধারে। ইংরেজরা সেসব মাঝে মাঝে গাড়ী ভরে সমুদ্রে ফেলে দিত। কিন্তু জাপানীদের ও নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তাই সেগুলো ওখানে তখন পড়ে পড়ে পচচ্ছে। চালের অভাব হতেই লোকের নজর পড়লো ঐ সুখাদ্যগুলোর উপর। কিন্তু এর উপরেও জাপানীদের কড়া পাহারা। সুতরাং চুরি করা ছাড়া এ হেন জিনিসও পাওয়ার উপায় নেই। আর সে চুরি করার উপায়ও ছিল অদ্ভুত।

আজকাল যেমন টেরিকট, টেরিলিনের যুগ চলছে, কাপড়ের অভাবে আন্দামানে তখন চটের পোশাকের প্রায় সেই রকম কদর। ভুষি-চোর চটের লম্বা প্যান্ট পরে তার ভেতর দু পায়ের সংগে দুটো লম্বা চটের থলি ঝুলিয়ে কাজে বার হতো। তারপর সুযোগ বুঝে ভুষির স্তূপ থেকে থলে দুটোতে ভুষি ভর্তি করে, সান্ত্রীদের চোখের সামনে দিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে আসতো।

কিন্তু দিনে এইভাবে বড়জোর দু-এক কেজি পাচার করা সম্ভব। অথচ ধরা পড়লে প্রহার সুনিশ্চিত, প্রাণও যেতে পারে। তা সত্ত্বেও ক্ষিধের এমনি জ্বালা যে, এ চুরিরও বিরাম ছিল না।

বাঙালীরা এ জিনিসটা কুলোয় ঝেড়ে তুষ, কুঁড়ো, খুদ আলাদা করে ফেলতো। কুঁড়ো সমুদ্রের লবণ জলে সেদ্ধ করে খেত। খুদগুলো জমিয়ে যেদিন খেত, সেদিন হতো তাদের ফিস্ট অর্থাৎ ভোজ। পাঞ্জাবী-সিন্ধিরা এ কৌশল জানতো না। তারা সবটাই না বেছে ভুষিসুদ্ধ সেদ্ধ করে খেত। তার ফলে যারাই তা খেয়েছে, তারা সবাই প্রায় পেটের অসুখে ভুগে মারা গিয়েছিল।

এ দেশের লোককে জাপান থেকে খাবার এনে খাওয়ানোর কথা জাপানীরা চিন্তাও করতো না। এমনিতে তাদের প্রায় দশ হাজার সেনার রসদ আর সেই সঙ্গে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, গোলা, বারুদ, পেট্রল, কামান, বন্দুক সবই আমদানী করতে হতো জাপান থেকে। তার উপর পথে আছে জাহাজডুবির ভয়।

এ অবস্থায় দেশী লোকদের জন্য খাদ্য আমদানি করার বদলে তারা লোক কমানোর উপায় ভাবতে শুরু করে দিল। উপায়টি এমন হওয়া চাই যে, এক সঙ্গে অনেক লোক কমে যায় এবং দেশের লোক টের পেয়ে গোলমাল না করতে পারে। সবার উপরে বাইরের জগতে যাতে খবরটা না পেঁাছে যায়। এই উপায়টাই হলো সেই রাউন্ড আপ।

আরো একটা কারণ ছিল, যার জন্যে জাপানীরা পাইকারী হারে ধরপাকড় শুরু করে দিল। তারা জানতো যে, আন্দামানে অল্প যে কয়জন লেখাপড়া জানা লোক আছে, একমাত্র তারাই পারে জাপানী শাসনের ভালোমন্দ বিচার করতে, লোকদের উস্কানি দিতে কিংবা ইংরেজ-দের খবরাখবর পাঠাতে। তাই দক্ষিণ আন্দামানে যত শিক্ষিত কিংবা অল্প-শিক্ষিত লোক ছিল, জাপানীরা দিকে দিকে হানা দিয়ে তাদের সবাইকে এনে জেলে পুরল। সাধারণ ভাবে এদের বিরুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে কাজ করার অভিযোগ আনা হতো। জাপানীদের চোখে এরা সবাই ছিল ইংরেজদের গুপ্তচর বা spy।

এদের ভেতর ছিলেন হাই স্কুলের শিক্ষক প্রতাপ নাগ বি. এসসি., বি. টি., ব্রজেন্দ্রলাল সাহা বি. এসসি., বি. টি., ডাঃ সুরেন নাগ, ইন্সপেক্টর নারায়ণ রাও, আত্তার সিং, খালেক ইত্যাদি। স্পাই কেসে প্রথমে বলি হয়েছিলেন সাত জন। তাদের ভেতর সুরেন নাগ, নারায়ণ রাও আর আত্তার সিং ছিলেন অন্যতম। এঁদের উপর প্রায় দেড় মাস ধরে অনবরত অত্যাচার করার পর জেলের পেছনে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গুলি করে মারা হয়। এঁদের বিরুদ্ধে কিন্তু কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নি।

এর পরেই জেলে আটক বন্দীদের ভেতর থেকে শিক্ষক প্রতাপ নাগ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর প্রেমশংকর ও আরও সাঁইত্রিশজনকে একটা ট্রাকে বোঝাই করে জাপানীরা আমাদের পাশের গ্রাম হামফ্রেগঞ্জে নিয়ে আসে। সেখানে একটা টিলার উপর আগে থাকতেই ট্রেঞ্চ খোঁড়া ছিল। তারই কিনারায় চোখ বেঁধে সবাইকে দাঁড় করিয়ে জাপানীরা মেশিনগানের গুলিতে সাবাড় করে দিল!

এদিকে ব্রজেন্দ্রলাল, দুর্গাপ্রসাদ ও অন্য সবাইকে বিখ্যাত সেলুলার জেলে কয়েদ করে রাখা হয়েছে।

দুর্ভেদ্য এই সেলুলার জেলখানা। এর ঠিক মধ্যিখানে পাঁচতলা প্রমাণ উঁচু একটা টাওয়ার, যেমন কলকাতার গড়ের মাঠের মনুমেন্ট। তার উপর দাঁড়িয়ে জেলখানার প্রতিটি আনাচে কানাচে দিনরাত্তির সতর্ক নজর রাখা যায়। গরুর গাড়ীর চাকার মাঝখানের একটা কাঠ থেকে যেমন সরু সরু কাঠ বার হয়ে চাকার বেড়কে আটকে রাখে, ঠিক তেমনি ভাবে সাতটা দালান এই টাওয়ার থেকে সাত দিকে বার হয়ে বিশ ফুট উঁচু বাইরের পাঁচিলের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

এই দালানগুলোর নাম ব্যারাক। প্রত্যেক ব্যারাক তিন তলা। এতে অনেকগুলো ছোট ছোট খোপ। দেওয়াল দু ফুট মোটা, শক্ত ইটের পোক্ত গাঁথুনি। সামনে দিয়ে একটা ১০ ফুট চওড়া বারান্দা প্রতি তলার একদিক থেকে অপর দিকে চলে গেছে। সেটা এক ইঞ্চি মোটা লোহার শিক দিয়ে বন্ধ। প্রতি কুঠুরিতে একইঞ্চি শিক দিয়ে তৈরী দরজা, তার লোহার ফ্রেম দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা। দরজার উল্টো দিকের দেওয়ালে ছাদের একটু নিচেয় একটা ১৮ ইঞ্চি×৯ ইঞ্চি জানলা, তাও মোটা লোহার শিক দিয়ে বন্ধ। কুঠুরির ভেতরের মাপ ৮ ফুট×১২ ফুট×১০ ফুট। এরই নাম ইংরেজীতে সেল (cell)। তাই এই জেলখানার নাম সেলুলার জেল (Cellular Jail)।

প্রতিটি ব্যারাক একটি অপরটির দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকটিতে প্রতি তলায় পঁয়ত্রিশটি সেল বা কুঠুরি। তা হলে হিসেব করলে দেখা যায়, মোট ৩৫×৩×৭=৭৩৫ জন কয়েদীর এখানে থাকার ব্যবস্থা ছিল। এখন ভেবে দেখা যাক, যদি ৭৩৫ জনের জায়গায় দু হাজারের বেশী লোক এখানে রাখা হয়, তাহলে তাদের অবস্থা কি রকম দাঁড়াবে। আসলে হয়েছিলও তাই। দিনের পর দিন সবাইকে ছাগল-ভেড়ার মতো গাদাগাদি করে থাকতে হতো।

এই সব নিরপরাধ হতভাগাদের দুর্দশা কিন্তু এখানেই শেষ হয় নি। প্রত্যেক দিন সকালে ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ছিল সাজার প্যারেড। শিক্ষিত লোক-দের হাতের নখের ভিতর সুচ গরম করে ঢুকিয়ে দেওয়া, কাঠের তৈরী ত্রিভুজের মত ফ্রেমের সঙ্গে লটকিয়ে উলঙ্গ করে বেত মারা বাদেও একটা অদ্ভুত সাজা দেওয়া হতো। জনা পঞ্চাশকে লাইনে দাঁড় করিয়ে প্রত্যেককে এক ইঞ্চি মোটা দু ফুট লম্বা একখানা করে লাঠি দেওয়া হতো। তাঁরা উবু হয়ে হাঁটুর পেছনে লাঠিখানা ঊরু দিয়ে চেপে বসে পড়তেন। হাত দুটো মাথার উপরে তোলা।

তাতে আলাদা ভাবে পাথর, ইট কি বই তুলে রাখতে হতো। এই ভাবে অন্ততঃ এক ঘণ্টা থাকতে হতো তাঁদের। একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। লাইনের পেছনে মোটা ডাণ্ডা হাতে একজন সৈন্য টহল দিচ্ছে। একটু নড়াচড়া করলেই কিংবা হাত কেঁপে ইট কি বই পড়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি।

এ বাদে দুর্গাপ্রসাদবাবুর মতো বিশিষ্ট বন্দীদের জন্যে এক বিশেষ ধরনের সাজার ব্যবস্থা ছিল। তাঁদের উলঙ্গ করে দু ঊরুতে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতো। তার ফলে দগদগে ঘা থাকতো সব সময়। কোন চিকিৎসাই হতো না। চলাফেরা শোয়া বসা সবই ছিল নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক। দুর্গাপ্রসাদবাবু এবং অন্যান্য যাঁরা এর পরে আজও বেঁচে আছেন, তাঁদের শরীরে এই পৈশাচিক নির্যাতনের চিহ্ন পরিষ্কার ফুটে আছে। ইলেকট্রিক শক দেওয়া তখন অতি সাধারণ শাস্তি বলে গণ্য হতো।

কেন এরকম সাজা দেওয়া হতো, এ প্রশ্নটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এঁরা যে ইংরেজদের চর, এই কথাটা এঁদের দিয়ে কবুল করানোই ছিল এই সব সাজার উদ্দেশ্য। দেশের ভেতর জাপানীরা কোথায় কি করছে, এসব খবর ইংরেজরা ঠিকই পেয়ে যেত। নিশ্চয়ই এ খবর এখানকার কেউ দিত। কিন্তু কে সে, সেটা বার করার জন্যে হন্যে হয়ে জাপানীরা পাইকারি হারে ধর-পাকড় শুরু করে দিয়েছিল। তবু আসল লোকের হদিস তখন মেলে নি, মিলেছিল যুদ্ধ শেষ হলে।

আগেই বলেছি, জাপানীরা পুরো তিন বছর সাত মাস দ্বীপগুলো দখল করে ছিল। রক্তস্নান করানোর কাজ তারা শুরু করেছিল দেড় বছর দখল করে থাকার পর। তত দিনে ইংরেজ পক্ষের প্রতিরোধ-ক্ষমতা অনেকটা বেড়ে গেছে। বঙ্গোপসাগরে জাপানী জাহাজ রসদ, গোলাবারুদ, সৈন্য নিয়ে আসছে খবর পেয়ে ইংরেজরা সেগুলো পরপর হয় সাবমেরিন নয় প্লেন দিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে। আর তার ফলে জাপানীরা দেশের শিক্ষিত লোক মাত্রকেই সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ঐ সব অত্যাচার।

অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেকে দোষ না করেও স্বীকার করতো। কেউ কেউ আবার আর এক-জনের নাম বলে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাইত। এত সত্ত্বেও ফলাফলে কিন্তু বিশেষ হেরফের হোত না। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু প্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টায় কিছু দিনের জন্যে হয়তো অত্যাচারের হাত থেকে সাময়িক রেহাই পাওয়া যেত। বন্দীদের কাছে এটাও কিন্তু বড় কম লোভের জিনিস ছিল না।

অবশ্য এত অত্যাচার ও রক্তপাত করেও জাপানীরা কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত আসল অপরাধীদের ধরতে পারে নি।

লোকা নামে একজন ওঙ্গি (দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের একটা শাখা) ইংরেজদের খুব অনুগত ছিল। জাপানীরা এলে তাদের সঙ্গেও সে সব সময়ে ঘোরাফেরা করতো। কেউই তাকে সন্দেহের চোখে দেখতো না।

জাপানীরা আসার সময় মিঃ ম্যাকার্থি ছিলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিস। জাপানীরা আসার ঠিক আগেই তিনি পালিয়ে যান। পরে তাঁকে ও আর একজন পাঞ্জাবী পুলিস কর্মচারীকে ইংরেজদের সাব-মেরিন বিভিন্ন দ্বীপের এখানে সেখানে নামিয়ে দিয়ে যেত রাতের অন্ধকারে। লোকা আগের থেকে খবর পেয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে সব খবর জানিয়ে দিত।

এ ছাড়া আগের পরিচিত অনেকের সঙ্গে ম্যাকার্থি যোগাযোগ করেছিলেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন মথুরা গ্রামের চৌধুরী বা গভর্নমেন্টের নিযুক্ত মোড়ল। একদিন ম্যাকার্থি সাহেব চৌধুরীর ঘরে বসে কথা বলছেন, এমন সময় জনা দুই জাপানী হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত। পালাবার রাস্তা না পেয়ে সাহেব ঢুকে গেলেন, যে খাটে বসে আলাপ করছিলেন, সেই খাটের তলায়। জাপানীরা বেশ কিছুক্ষণ সেই তক্তপোশের উপর বসে কথাবার্তা বলে বিদেয় হলো, আর ম্যাকার্থি সাহেবও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

এই ছিল সে সময়কার অবস্থা। আসল লোক ধরতে না পেরে জাপানীরা অত্যাচারের মাত্রা যে বাড়িয়েই চলবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

গুপ্তচরের সাজা প্রাণদণ্ড। কয়েদীরা তখন এই দণ্ড নেবার জন্যই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এর থেকে বোঝা যায়, কী নারকীয় অত্যাচার তখন চলেছিল। বন্দী থেকে মাসের পর মাস তিলে তিলে মরার চেয়ে গুলি খেয়ে কিংবা তরোয়ালের এক কোপে মরা ভালো মনে করে, সবাই দু-চার দিনের ভিতরেই 'স্বীকার' করতো যে, তারা সত্যিই গুপ্তচর, তারা ইংরেজদের খবরাখবর দিয়ে সাহায্য করেছে। কেউ বলতো, দিনের বেলায় সাদা কাপড় নেড়ে সে ব্রিটিশ প্লেনকে সংকেত করেছে। কেউ বা 'স্বীকার' করতো যে, রাত্তিরের অন্ধকারে আগুন জেবলে সে জায়গা বাৎলে দিয়েছে। তারা যে শুধু এক-

দিন কিংবা একবারই এসব কথা বলতো তাই নয়, বেঁচে থাকার ভয়ে বারবার, দিনের পর দিন একই কথা বলে চলতো দৃঢ়তার সঙ্গে।

এই সব 'স্বীকারোক্তি'র উপর নির্ভর করে যখন ব্যাপকভাবে গুলির ব্যবস্থা হয়েছে, ঠিক তখন জাপান থেকে একজন জজ এলেন। এক সঙ্গে এতগুলো স্পাইং কেস! ব্যাপারটা সন্দেহজনক, তাই তদন্ত করার জন্যই তাঁর আগমন।

তিনি এসেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে।

তত দিনে জাপানীরা আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বেসামরিক শাসন ভার ছেড়ে দিয়েছে। ফলে এই আন্দামান হয়েছে তখন ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীন প্রদেশ। পোর্টব্লেয়ারের জিমখানার মাঠে নেতাজী প্রথম স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা ঝান্ডাকে অভিবাদন করলেন।

দুঃখের বিষয়, বর্তমান সরকার এ হেন জায়গাটাতে কোন স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করেন নি, এমন কি নেতাজীর নামে একটি রাস্তারও আজো নামকরণ হয়নি।

জজ এসে প্রত্যেকটি কেস বিচার করে দেখেন যে, দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন সবাই বলছে, তারা ইংরেজের গুপ্তচর। তা যদি সত্য হয়, তাহলে দেশটা জয় করতে ইংরেজদের এত দিন লাগছে কেন? তিনি নানা ভাবে বন্দীদের অভয় দিলেন। শেষে তারা আসল কথা খুলে বললো। সর্বাঙ্গে অত্যাচারের জ্বলন্ত প্রমাণ দেখিয়ে জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের অত্যাচার বর্ণনা করলো। ফলে জজের বিচারে সবারই একসঙ্গে মুক্তির হুকুম হলো।

হুকুম তামিল হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য—মনে রাখবার মতো! মনে হলো, বন্দীরা বুঝি নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে। অত্যাচারে যে এমন কি পঙ্গু-মৃতপ্রায়, সেও ছুটে চলেছে পথ দিয়ে আর ছোট-বড় বিচার না করে যাকে দেখছে, তারই পায়ের ধুলো তুলে মাথায় নিচ্ছে! সবারই মুখে এক কথাঃ আশীর্বাদ করো, যেন আবার ওই ভয়ঙ্কর নরকে ফিরে যেতে না হয়!

এদিকে জেলের ভেতর যখন এই সব তান্ডব চলেছে, তখন জেলের বাইরের লোক যে সুখে শান্তিতে আছে, তা নয়। জোয়ানরা সবাই হয় জেলে আটক, নয়তো মরে শান্তি পেয়েছে। প্রায় বাড়িতেই রয়ে গেছে শুধু শিশু, ছেলেমেয়ে, বুড়ো পুরুষ আর মেয়েলোকের দল। জমিতে চাষ হচ্ছে না, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ঘরে ঘরে নানান অসুখ।

তাই যেমন জেলের ভেতরে, তেমনি বাইরেও তখন জাপানীদের পক্ষে লোকের চাপ কমাবার খুবই দরকার পড়েছে। উপায় বার করতেও জাপানী মাথার বেশী দেরি হলো না। তারা জনসাধারণের মধ্যে লাল, সাদা কিংবা হলুদ রঙের টিকিট বিলি করে দিল। সবাইকে বলা হলো, কাছেই একটা জায়গায় প্রচুর চাষের জমি পাওয়া গেছে, সেখানে সবারই বসতি দেওয়া হবে।

যাদের লাল টিকিট দেওয়া হয়েছিল, প্রথমে তাদের জাপানীরা একটা এল. সি. টি. (L.C.T.)-তে অর্থাৎ জাহাজ থেকে সৈন্য বা মালপত্র নামানোর বোটে নিয়ে গিয়ে তুললো। এ ধরনের নৌকোতে প্রচুর খোলা জায়গা থাকে, তাই অনেক লোক নেওয়া চলে। বোটবোঝাই লোক নিয়ে একদল সৈন্য রওনা হয়ে গেল। পোর্টব্লেয়ার থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে হ্যাভেলক বলে একটা দ্বীপ আছে। তখন সেখানে কোন লোকের বসতি ছিল না। সেই দিকেই বোট চলেছে।

দ্বীপ তখনো তিন-চার মাইল দূর। এমন সময় খোলা সমুদ্রে বোট দাঁড় করানো হলো। হুকুম হলো, সমুদ্রে নেমে সাঁতরে কূলে উঠতে হবে। অন্ধকার রাত। কেউ এতটুকু ইতস্ততঃ করলে তাকে সঙ্গীনের খোঁচা মেরে জলে নামতে বাধ্য করা হলো— তা সে সাঁতার জানুক আর নাই জানুক, তাতে

বোটের সার্চলাইট জেবলে তাদের উপর দিয়ে বোটটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালিয়ে.....

কিছু যায় আসে না। বলা বাহুল্য ডুবে মরলো অনেকে। আর যারা সাঁতার কেটে কূলের দিকে চললো, তাদেরও ব্যবস্থা হলো। বোটের সার্চলাইট জেবলে তাদের উপর দিয়ে বোটটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালিয়ে নেওয়া হলো। এর পরেও বেঁচে রইল যেসব হতভাগ্য, তাদের পুনর্বাসন হলো মেশিনগানের গুলিতে।

এত সত্ত্বেও জনাচল্লিশেক বন্দী সাঁতরে কূলে উঠলো। এদের ভিতরে একজন ছিলেন হীরালাল বাবুর বড় ভাই। নাম রামচন্দ্র। জাপানীদের হাতে মারা না গেলেও বিপদ কিন্তু তাঁদের এখানেই শেষ হলো না।

একদল দুর্দান্ত বর্মী কয়েদী জাপানীরা আসবার আগেই পোর্টব্লেয়ার থেকে পালিয়ে ডিঙ্গিতে চড়ে, খোলা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হ্যাভেলকের গভীর জঙ্গলে বাসা বেঁধেছিল। এখন জাপানী বোট এত কাছে এসে গুলি ছুড়ছে দেখে তাদের ভয় হলো, ওরা হয়তো তাদেরই ধরতে এসেছে। পরদিন সকালে লুকিয়ে ব্যাপারটা জানতে এসে তারা দেখে, জাপানীদের বদলে বসে আছে জনাচল্লিশেক ক্ষুধার্ত, উলঙ্গপ্রায় বীভৎস চেহারার লোক। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে চূড়ান্ত হতাশা আর আতঙ্ক। বর্মীরা পরিষ্কার বুঝলো জাপানীরাই এদের এখানে এনে ফেলে গেছে।

বর্মীরা কোথায় তাদের নিজেদের দলে ডেকে নেবে, বনের অজস্র ফলমূল ও নদীর মাছ সবাই ভাগ করে খাবে, তা নয় হঠাৎ ডাণ্ডা-পাথর নিয়ে ওরা তাদের উপর চড়াও হলো। এরাও উপায়ান্তর না দেখে হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে লড়াই শুরু করে দিল। এরা ছিল সংখ্যায় বেশী, তাই বর্মীরা শেষ পর্যন্ত বেশ কয়জন হতাহত ফেলে রেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। তখন এদের ভেতর মাত্র জনা সাত-আট বেঁচে আছে।

এর পর শুরু হলো তাদের বেঁচে থাকার দুরন্ত প্রয়াস। খাদ্য বলতে সমুদ্রতীরের ঝিনুক ও শামুক। বনে ঢোকার উপায় নেই। সেখানে আছে বর্মীরা। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। তাই ঠিক হলো, যা থাকে কপালে, সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে।

কোন মতে ভেলা একটা তৈরী হলো। সমুদ্রে ভাসলো একদিন। একে তো ভেলাটা ছিল খুবই কম মজবুত, অত্যন্ত পল্‌কা। তার উপর হাল-পাল কিছুই নেই। সুতরাং সামান্য একটু ঝড়েই ভেলাটা এক পাহাড়ে টক্কর খেয়ে উল্টে গেল। ফলে চারজন বাদে বাকী সবাই শেষ! হীরালাল বাবুর বড় ভাই রামচন্দ্রও এইখানে মারা পড়েন। ইংরেজ এসে এই চারজনকে উদ্ধার করে। এঁদের ভেতর দুজন এখনও বেঁচে আছেন। একজনের নাম সওদাগর। তিনি লেবার ফোর্সের সুপারভাইজার।

এরই দিন দশেক পরে জাপানীরা দ্বিতীয় রাউণ্ড আপ করলো। এবার এর ভেতর বেশীর ভাগই ছিল এবার্ডিনের বণিক ও ধনিক শ্রেণীর লোক। এঁদের পোর্টব্লেয়ার থেকে মাইল ছয়েক দূরে গারাচারামা গ্রামের বন্দীশিবিরে জড়ো করা হয়। উপযুক্ত সংখ্যক লোক সংগ্রহ হতেই এক অন্ধকার রাত্রে চারপাশ ঢাকা ট্রাক তাদের বোঝাই করে অজানা জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। প্রত্যেক ট্রাকেই জনাকয়েক করে জাপানী সৈন্য মোতায়েন। উদ্দেশ্য, যাতে কেউ পালাতে না পারে। তাদের বলা হয়েছে যে, অন্য এক শিবিরে তাদের চালান দেওয়া হচ্ছে।

এত সতর্কতা সত্ত্বেও কিন্তু একজন বন্দী অন্ধকারে সৈন্যদের চোখ এড়িয়ে ট্রাক থেকে গড়িয়ে নীচে রাস্তায় পড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। তার নাম ঘসিটা। ঘসিটা আজও জীবিত। আমাদেরই গ্রামের কাছে অনেকখানি জঙ্গল কেটে সরকারকে বেদখল করে সে গরু-ছাগল নিয়ে জাঁকিয়ে বসে গেছে এবং ভালই আছে।

জাপানীরা সাধারণতঃ ভদ্র মেয়েছেলের উপর কোন অত্যাচার করেনি বা প্রাণেও মারেনি। কিন্তু এই রাউণ্ড আপে একজন মা কিছুতেই তাঁর ছেলেকে জাপানীদের হাতে ছেড়ে দিতে চাইলেন না। বাধ্য হয়ে মাকেও তারা শিবিরে ছেলের সঙ্গে বন্দী করলো। ইনি শেষ

বন্দুকের কুঁদোর গুঁতোয় এক-এক করে সবাইকে ট্রাক থেকে নামিয়ে প্রত্যেককে......

অবধি ছেলের দুঃখকষ্ট এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ভাগ করে নিয়েছিলেন। এই দলে ছিলেন হীরালালবাবুর সেজভাই রামলাল।

ট্রাকগুলো বন্দীদের নিয়ে এবার্ডিন থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে লোহাবারক বলে একটা পাহাড়-জঙ্গলভরা বসতিহীন এলাকায় এসে থামলো। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এখানে এসেই জাপানীরা ভালমানুষী মুখোশ খুলে স্বমূর্তি ধারণ করলো। বন্দুকের কুঁদোর গুঁতোয় এক-এক করে সবাইকে ট্রাক থেকে নামিয়ে প্রত্যেককে এক-একটা গাছের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে বেঁধে দিল। তারপর শুরু হলো হতভাগাদের ওপর বেয়নেট প্র্যাকটিস। অর্থাৎ সঙ্গীনের খোঁচায় এদের শেষ করা হলো।

এর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল তৃতীয় রাউন্ড আপের তোড়জোড়। সব ব্যবস্থাই প্রায় শেষ, এমন সময় হিরোসিমায় অ্যাটম বোমা পড়লো। বিনাশর্তে আত্ম-সমর্পণ করলো জাপান।

বন্দীরা সবাই ছাড়া পেয়ে গেল। মুক্তির দীর্ঘ-শ্বাস ছাড়লো রক্তস্নাত বিপর্যস্ত আন্দামান। মাস্টার ব্রজেন্দ্রলাল এই দলে ছিলেন। তিনি এর আগের দুই রাউন্ড আপেও টিকিট পেয়েছিলেন। কিন্তু দুবারই সংখ্যা পুরো হয়ে যাওয়ায় তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ইনি এখন শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

হীরালালবাবুর খুবই জোর বরাত যে, বড় দুই ভাইয়ের সঙ্গে তিনি ধরা পড়েন নি। তিনি ক্রমাগত এক বস্তী (গ্রাম) থেকে অন্য বস্তীতে ঘুরে বেড়াতেন বলে জাপানীদের হাত এড়াতে পেরেছিলেন।

শেষটা যখন তাঁকে পাকড়ে এবার্ডিনে নিয়ে আসা হলো, তখন যুদ্ধ শেষ হবার মুখে। উপরন্তু তাঁর বয়স কম আর লেখাপড়া জানেন। তাই জাপানীরা তাঁকে এক খবরাখবর-দপ্তরে নিয়ে এল। এটা ছিল একটা বিশেষ ধরনের স্কুল। এখানে বাছাই-করা ছেলেদের এনে মাসখানেক তালিম দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হতো। তাতে যারা ভাল ফল দেখাতে পারতো, তাদের জাপানী সরকারে চাকরি মিলতো। জাপানী ভাষায় এ স্কুলকে বলা হতো 'নানতাই স্কুল' (Intelligence Training Camp)। নোদাসাঁ নামে একজন উচ্চপদস্থ জাপানী অফিসার এই স্কুল পরিচালনা করতো।

হীরালালবাবু যখন এখানে এলেন, তখন ২৮ জন ছেলের একটা ব্যাচ্ বা দলের পরীক্ষা সবে সেই দিন শেষ হয়েছে। তাঁকেও সেই দলে ভর্তে করে বলা হলো, তাঁর পরীক্ষা পরের দিন। তাঁর নম্বর হোল ২৯।

বিচিত্র এই পরীক্ষা। প্রত্যেক দিন একটি করে ছেলের পরীক্ষা নেওয়া হয়—সন্ধ্যে ৬টায় শুরু হয়ে সকাল ৫টা অবধি। প্রশ্ন ও উত্তর সবই মুখে মুখে—ইংরেজীতে। ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ে, একটা বড় টেবিলে রুটি, মাখন থেকে শুরু করে মাছ, মাংস, মিষ্টি, এমন কি দু-তিন রকমের মদ পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ রয়েছে। নোদাসাঁ ছাড়া আরো দুজন পদস্থ কর্মচারী ঘরের এক পাশে একটু দূরে বসে আছে। তাদের থেকে একটু দূরে একজন কেরানীর মতো লোক শর্টহ্যাণ্ডের সাঙ্কেতিক ভাষায় সওয়াল-জবাব লেখবার জন্যে তৈরী।

প্রথমেই বলা হয় রাত্তিরের খাওয়া সেরে নিতে। সে সময়ে আন্দামানের অধিবাসীদের খাওয়ার শোচনীয় দুরবস্থার কথা আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং সাধারণ যে কোন লোকের পক্ষে এরকম ভোজের ব্যাপার স্বপ্নেরও অগোচর। লোভ সামলানো বড়ই কঠিন। তাই অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই আগুপিছু বিবেচনা না করে গোগ্রাসে খেতে শুরু করে দেয়। কিন্তু এর পরিণাম হয় খারাপ। বোঝা যায়, ছেলেটি লোভ সামলাতে পারে না অর্থাৎ মনটা তার দুর্বল। তার পর আকণ্ঠ খাওয়ার ফলে চোখ ভেঙ্গে নেমে আসে ঘুম। সুতরাং সে আবোলতাবোল বকতে শুরু করে দেয়।

হীরালালবাবু ঠিক করলেন, তিনি এ ফাঁদে ধরা দেবেন না। তা ছাড়া কপালে যাই থাক, ওদের প্রশ্নের উত্তরে যা সত্যি, যা উচিত মনে করবেন, নির্ভীকভাবে তাই বলে যাবেন এবং যা করা উচিত, তাই করবেন।

তাই প্রথমেই তাঁর মনে হলো, আজ এই সময় এ দেশে আমার আত্মীয়-বন্ধুদের অনেকেই তাদের পরিবারের ছোটছোট শিশু, রোগী নিয়ে একমুঠো ভাতের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। আমি যদি সুযোগ পেয়ে শত্রুর দেওয়া এইসব খাবার একাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হই, তাহলে মহাপাপ করবো।

তাই তিনি সবচেয়ে সাধারণ খাবার নিয়ে, তাও খুব কম করে খেলেন।

তার পরই শুরু হলো নানান বিষয়ে প্রশ্ন। তার মধ্যে দু-একটার নমুনা দেওয়া যাকঃ—মানুষ সামাজিক জীব বলেই সভ্য হয়েছে, এ কথাটা ঠিক? বর্তমানে জীবনে সামাজিকতার কোন দরকার আছে কি? এক সমাজে যেটা দুর্নীতি, অপর সমাজে সেটা নীতি-সম্মত। তাহলে প্রকৃত নীতি কি?

এ ছাড়াও ছিল আরও অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন।

হীরালালবাবু যা ভাল মনে করলেন, তা-ই বলে গেলেন জবাবে—ওদের পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা না করে।

তবুও তাঁর উত্তরগুলো যে তাদের খুবই ভাল লেগেছিল, তা বোঝা গেল শেষ রাত্রে, যখন নোদাসাঁ জিজ্ঞাসা করলো, 'মাস্টার, তুমি কত দূর লেখাপড়া করেছ?'

উত্তরে হীরালালবাবু বললেন, 'আমি কলকাতা ইউনিভার্সিটির ম্যাট্রিক পাস মাত্র।'

নোদাসাঁ বললো, 'অসম্ভব! তুমি মিথ্যে বলছো।'

হীরালালবাবু যে একটুও মিথ্যে বলেন নি, সেটা বোঝাতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তারপর কি মনে হওয়াতে তিনিই নোদাসাঁকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'স্যার, যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞেস করি, আপনার পড়াশুনো কত দূর?'

সামরিক আইনে এরকম প্রশ্ন করা গুরুতর অপরাধ হলেও নোদাসাঁ একটুও অসন্তুষ্ট না হয়ে জবাব দিল, 'আমি টোকিও ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে বিদেশে এই লাইনে চার বছর শিক্ষা নিই। তারপর নিজেদের সামরিক দপ্তরে চাকরি নিয়েছি।'

ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। মুখ ধোবার জন্যে চা-পাতা ভেজানো গরম জল এল। তারপর এল যথারীতি দুধচিনি-দেওয়া চা। পরীক্ষার পর্ব শেষ।

পরদিন শেষ ক্লাস। ঊনত্রিশজন পরীক্ষার্থীদের বিদায় দেবার অনুষ্ঠান। সবাই উপস্থিত। নোদাসাঁ ক্লাসে ঢুকেই বোর্ডে বড় বড় হরফে ইংরেজীতে লিখলো—সাগোসাঁ। তারপর বললো, জাপানীদের চোখে অসাধারণ বিজ্ঞ লোকটি। 'ইনি হাজার বছর পূর্বে জন্মান।'

এর পর হীরালালবাবুকে ডেকে নোদাসাঁ তাঁকে 'সাগোসাঁ' উপাধি দিল। আরো ভরসা দিল যে, যুদ্ধ শেষ হলে তাঁকে জাপানে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তিনি ইচ্ছে করলে স্থায়িভাবে বাস করতে পারবেন, জাপ সরকারের খরচায় ফিরেও আসতে পারবেন।

সব শেষে নোদাসাঁ হীরালালবাবুকে উপহার দিল নগদ পঞ্চাশ টাকা আর পঞ্চাশ প্যাকেট ভর্তি একবাক্স সিগারেট, আর একজোড়া বুশ্ কোট যার দাম সাধারণ লোকের কাছে তখন সোনার চেয়েও বেশী।

এরই দু দিন পরে অ্যাটম বোমা পড়লো হিরোসিমা আর নাগাসাকির উপর। যুদ্ধ খতম হবার সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের কবল থেকে ছাড়া পেয়ে সবাই যে যার মতো দে ছুট! হীরালালবাবুও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে গা-ঢাকা দিলেন। তাঁর তখনও ভয়—কি জানি আবার যদি ধরে!

গত মাসের ও এ মাসের
প্রচ্ছদ বা মলাট

শুধুই কি আবরণী বা আভরণ-সজ্জা? না, আর কিছু? কি বলতে চায় সে?

গ্রাম বাংলার এক অবহেলিত ভাঙা মন্দির।

তাকে ঘিরে বাবলা, বাঁশ, ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। ভর দুপুরেই গা ছমছম। সন্ধ্যে বেলায় শেয়াল ডাকে। আর মাঝরাতে?

ওদিকে কেউ সহজে যায় না।

যাবার পথও নেই।

পুজোও নেই সেথায়। সন্ধ্যেবেলায় দীপ জ্বলে না, বাজে না সন্ধ্যা-আরতির ঘন্টা।

কতকাল? কতকাল দাঁড়িয়ে আছে ঐ অনাদৃত জীর্ণ দেউল?

ও কি কিছু বলছে?

তাই কি ভর দুপুরে—চারদিক যখন নিঝুম—নিঃসঙ্গ তরুণ পথিক জঙ্গল ভেঙে চলেছে মন্দিরের দিকে?

হয়তো-বা তার কানে এসেছে এক কান্নার সুর। অবহেলিত জীর্ণ দেউলের বুক দীর্ণ করে গুমরে উঠছে এক চাপা কান্না। বেদনাহত তরুণ নির্বাক বিস্ময়ে শোনবার চেষ্টা করছে সে অব্যক্ত কান্নার ভাষা। নির্জন স্তব্ধ দুপুরে সে কান পেতে শুনছে, অতীত বাংলার শিল্প-ভাস্কর্যের গরিমার স্মৃতি মন্থন করে বুকভাঙা করুণ দীর্ঘশ্বাস উঠছে বর্তমান ছন্নছাড়া ভাঙা বাংলার ভাঙা দেউল থেকে।

তারপর?

কালো শয়তানের অপমৃত্যু

তুষারকান্তি বসু

কালো শয়তান কবে কি-ভাবে শয়তানে রূপান্তরিত হয়েছিল, তা কেউ সঠিক বলতে পারে না। তবে এ ব্যাপারে দুটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুই ঘটনার সময়কাল প্রায় এক। এবং সেই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যেই কালো শয়তানের হাতে পর পর কয়েকজন লোক মারা পড়ে।

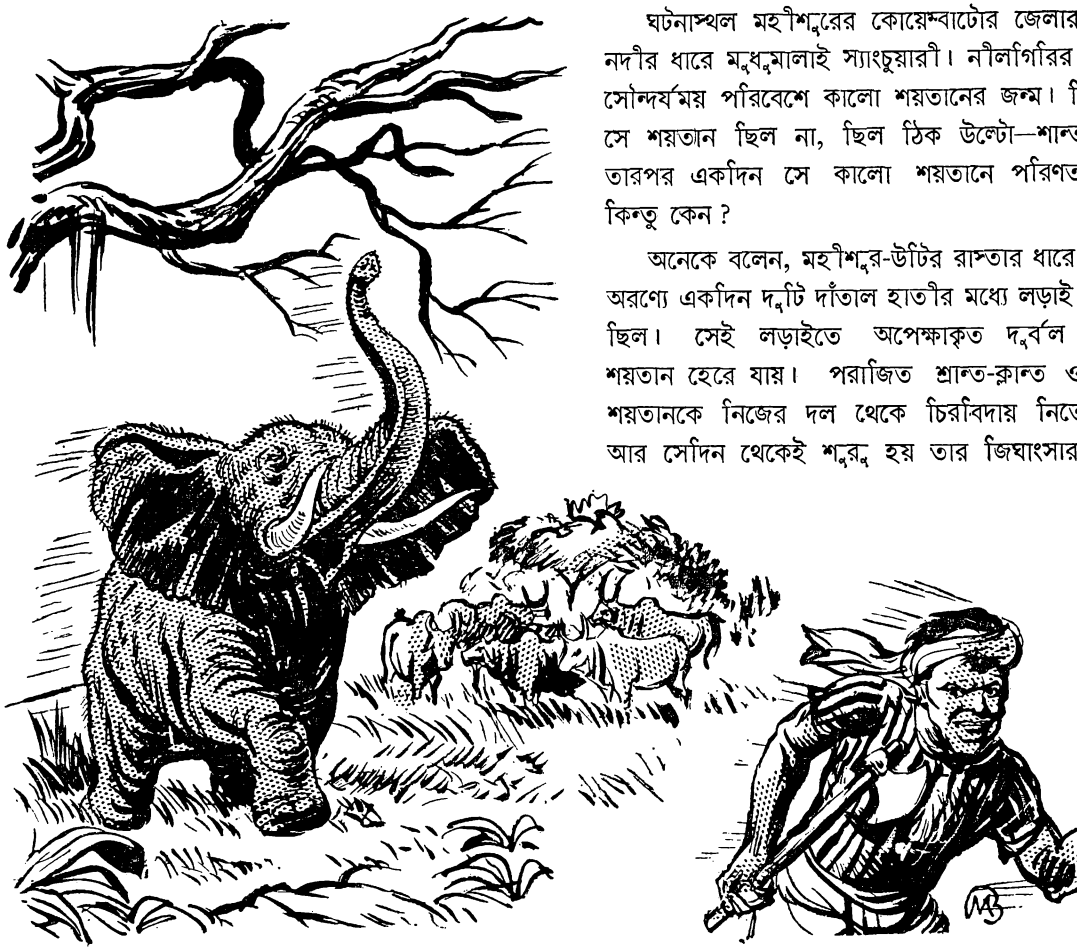

কিন্তু দু পাও রাখালকে যেতে হলো না, তার আগেই মেল-ট্রেনের গতিতে কালো শয়তান......

ন ফুট উঁচু, কুচকুচে তেল-চোয়ানো কালো রং এবং শালকান্ডের মত শুঁড়ের দুপাশে শীতের বালি-হাঁসের মত চকচকে চার ফুট লম্বা দাঁত—এই ছিল কালো শয়তানের চেহারা। এর উপরে ছিল সর্বাঙ্গে তিন-চার ইঞ্চি লম্বা ঘন লোম। সেই সঙ্গে কুতকুতে দুই চোখে ছিল পৃথিবীর সবটুকু ক্রূরতার ছেঁকে-নেওয়া নির্যাস। এই জন্যই তার নাম দেওয়া হয়েছিল কালো শয়তান।

সবাই জানেন, হাতী কলেবরে বিরাট ও জবুথবু হলেও বুদ্ধিতে জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে সামনের সারির আসন তার বাঁধা। সেদিক থেকে কালো শয়তানও ছিল ধূর্ত-চূড়ামণি।

ঘটনাস্থল মহীশুরের কোয়েম্বাটোর জেলার ময়ার নদীর ধারে মুধুমালাই স্যাংচুয়ারী। নীলগিরির অপার সৌন্দর্যময় পরিবেশে কালো শয়তানের জন্ম। চিরকাল সে শয়তান ছিল না, ছিল ঠিক উল্টো—শান্তশিষ্ট। তারপর একদিন সে কালো শয়তানে পরিণত হল। কিন্তু কেন?

অনেকে বলেন, মহীশুর-উটির রাস্তার ধারে গভীর অরণ্যে একদিন দুটি দাঁতাল হাতীর মধ্যে লড়াই বেঁধে-ছিল। সেই লড়াইতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল কালো শয়তান হেরে যায়। পরাজিত শ্রান্ত-ক্লান্ত ও রক্তাক্ত শয়তানকে নিজের দল থেকে চিরবিদায় নিতে হয়। আর সেদিন থেকেই শুরু হয় তার জিঘাংসার একক অভিযান। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই যেন তার এই জিঘাংসা।

আবার অনেকে বলেন, কালো শয়তানকে হঠাৎ কেউ বন্দুক দিয়ে গুলি করেছিল ধান ক্ষেত থেকে তাড়ানোর জন্য। গুলি তাকে বেশ আহতও করেছিল। তারপর বেশ কিছুদিন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার পর সে

যখন একদিন গ্রামের আশেপাশে আত্মপ্রকাশ করল, তখন সে পুরোপুরি কালো শয়তানে পরিণত হয়েছে।

যাই হোক কারণ যাই থাক, কালো শয়তান তখন মানুষের কাছে শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়। কত নিরীহ লোক যে তার হাতে মারা পড়েছে, তা বলা সম্ভব নয়। প্রায় ত্রিশ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত তার কর্মক্ষেত্র।

প্রথম ঘটনা ঘটে তাল্লামালাই গ্রামে। সেদিন সকালে গ্রামের একজন রাখাল ১৫।২০টা গরু চরাতে নিয়ে গেছে বনের ধারে। নিশ্চিন্ত মনে গরুগুলি ছেড়ে দিয়ে লোকটি এক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছে।

হঠাৎ গরুগুলি কি এক কারণে এক জায়গায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল। গরু কখন কেন এটা করে, রাখাল জানে। সাধারণত পালের মধ্যে বাঘ এলে, হয় তারা ছুট দেয় ছত্রভঙ্গ হয়ে, নয়ত এক জায়গায় গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ায়। রাখাল তার ধারালো টাঙ্গি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। একটা চিতা বা বাঘকে রুখবার মত সাহস তার আছে।

কিন্তু দু পাও রাখালকে যেতে হল না, তার আগেই মেল-ট্রেনের গতিতে কালো শয়তান তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে লোকটির চেহারা এক খণ্ড মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করল।

দূর থেকে অনেকে ঘটনাটা দেখতে পেয়েছিল। ঠিক দেখা নয়। তারা বুঝতে পেরেছিল। তাদের হৈ-চৈ চীৎকারে কালো শয়তান আবার বনের ভেতর ঢুকে পড়ে।

এর পরই কয়েক মাইল দূরের গ্রাম জীরগালির এক-জন কৃষকও তার হাতে মারা পড়ে। রাখালটার মত কৃষকটিও ধারণা করতে পারে নি যে, তার ক্ষেতের ধারে জঙ্গলের মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি মিশ খাইয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে তার সাক্ষাৎ শমন। সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল কালো শয়তান। তারপর উল্কাপিণ্ডের মত রক্ত-জল-করা কর্কশ চীৎকার ছেড়ে সে হতভাগ্য কৃষকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং বেচারার দেহের উপর চার পায়ে নেচে শেষে বিজয় গর্বে আবার ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। কিছু দূরেই কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রস্তরীভূত হয়ে এই নৃশংস দৃশ্য দেখল। তাদেরও কালো শয়তান দেখেছিল, কিন্তু সেদিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

ধীরে ধীরে কালো শয়তানের 'সুনাম' চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বন-বিভাগ এর চেহারার বর্ণনা দিয়ে জেলাশাসককে জানিয়ে দিল। জেলাশাসক এর পর তাকে 'মত্ত' বলে স্বীকার করে নিয়ে শিকারীদের আমন্ত্রণ জানালেন তার হাত থেকে ধনপ্রাণ প্রভৃতি রক্ষা করতে।

সঠিক জানা যায় না, এর পর কোন শিকারী একে মারবার চেষ্টা করেছিল কি না। যদি কেউ সে চেষ্টা করেও থাকে, তবে সে কথা কোন নথিপত্রে লেখা নেই। হয়ত কোন কোন শিকারী চেষ্টা করে থাকবেন। কিন্তু কালো শয়তান এমন ধূর্ত যে, কোন শিকারীকে তার ধারেকাছেও আসতে দেয় নি। শিকারীর আঁচ পেলেই শয়তান সে মুলুক ছেড়ে চলে যেত আর এক মুলুকে। পাহাড়ী দেশ। তাই ওর কাছে যা দশ মাইল, শিকারীদের কাছে তা একশ মাইলের সামিল।

কেনেথ এণ্ডারসন তখন বাঙ্গালোরে এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। শিকারে এক সময়ে তাঁর দক্ষিণ ভারতে বেশ নামডাক ছিল। তাঁরও কানে কালো শয়তানের কথা পেঁৗছেছিল। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে তেমন কোন গুরুত্ব দেন নি। কোন দিন চিন্তাও করেন নি যে, তাঁকে সাক্ষাৎ শমন ঐ কালো শয়তানের মুখো-মুখি দাঁড়াতে হবে। মৃত্যুর স্বাদ এণ্ডারসন পেয়েছিলেন কালো শয়তানের পাল্লায় পড়ে।

ঘটনাটা নেহাত আকস্মিক। দুর্ঘটনা বলাই ঠিক। নইলে ভারতভ্রমণরত এক ধনী মার্কিনতনয় নীলগিরি অঞ্চলের বাইসনের ছবি তুলতে চাইবেন কেন, আর নিজের সঙ্গী হিসেবে এণ্ডারসনকেই বেছে নেবেন কেন?

ভদ্রলোক পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছেন। পৃথিবীর সব বন-জঙ্গল ঘুরে প্রচুর ছবিও তুলেছেন। সবই চলন্ত ক্যামেরায়। এবার তাঁর লক্ষ্য বাইসন।

ভারতবর্ষে বাইসন খুব দুষ্প্রাপ্য নয়। তন্মধ্যে নীল-গিরি অঞ্চলের বাইসন খুবই বিখ্যাত। এণ্ডারসনের একজন শিকার-সঙ্গী ছিল রাচিন। নীলগিরির বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে তার ভাল ধারণা ছিল। সে জানত, মথার উপত্যকায় বাইসন পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে তারা মানুষকে খুব নিকট থেকে দেখলেও ভ্রূক্ষেপ করে না।

তারই নির্দেশে এণ্ডারসন বন্ধুকে নিয়ে পরদিন গাড়ী নিয়ে রওনা হলেন। গন্তব্যস্থল ডিমবম—তালাইমালাই রাস্তা থেকে ৭।৮ মাইল দূরের গ্রাম হোন্নাথোট্টি। রাচিন ওখানকার একজন পাকা পথ-

প্রদর্শককে সঙ্গে নিল। পথ-প্রদর্শক ছেলেটি জানাল, মাইল পাঁচ-ছয়ের মধ্যে বাইসন আছে। তারা দল বেঁধে থাকে। সকালে আর বিকেলেই তাদের বনের মধ্যে পাওয়া যায়, বাকী প্রায় সব সময় জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকে। ইচ্ছে করলে, বনে চরে বেড়াবার সময় অথবা জলে গা ভাসিয়ে থাকার সময় ওদের ফটো তোলা সম্ভব।

এন্ডারসনের গাড়ী রাস্তায় বার দুয়েক বেঁকে বসল। তাঁরা তখন ধারণাও করতে পারেন নি যে, এই ঘটনা এক অমঙ্গলের সূচনা, হয়ত তাঁদের বলছে, তোমরা ফিরে যাও—ফিরে যাও।

গন্তব্য স্থানে তাঁরা পেঁছালেন নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ ঘণ্টা বাদে। সন্ধ্যে হতে বিশেষ দেরী নেই। বাধ্য হয়ে তাঁরা গ্রামের পাশে তাঁবু টানিয়ে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করলেন। এই হোন্নার্থেট্টি গ্রামের ৪/৫ মাইলের মধ্যে বাইসনের দেখা পাওয়া সম্ভব। রাচিন এর আগে আরো অনেক সাহেবকে এখানে নিয়ে এসেছিল। কাজেই গ্রামের অধিবাসীদের কাছে সাদা চামড়া তেমন বিস্ময়ের কিছু নয়। সন্ধ্যে হতে না হতে অনেকেই তাঁবুর চার পাশে ভীড় জমাল।

এদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একজন শোলাগা তরুণ এন্ডারসনকে জানাল, বাইসনের বাথান তার জানা আছে। কয়েক মাইলের মধ্যেই বেশ কয়েকটি দঙ্গল সকালে-বিকেলে বনের মধ্যে চরে বেড়ায়। সাহেবদের সে বাইসনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারবে বলে জানাল।

রাত্রে আলোচনা করে ঠিক হল যে, রাচিন এবং তরুণটি ভোরে বের হয়ে যাবে। ওরা কোন দঙ্গলের দেখা পেলে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে। এই প্রখর গরমে সূর্য যখন মাথার উপর, তখন তারা নির্ঘাৎ কোন জলাশয়ের মধ্যে খেলা করবে। তাদের পায়ের ছাপ দেখে অনায়াসে ধরা যাবে, তারা কোন্ জলাশয়ে গেছে। ঘাসের বনে লুকিয়ে তখন ফটো তুলতে কোন অসুবিধা নেই।

পরিকল্পনা মত রাচিন এবং শোলাগা তরুণটি সকালে উঠেই রওনা দিল বাইসনের সন্ধানে। এন্ডারসন এবং তাঁর মার্কিন বন্ধু সারাটা সকাল তাঁবুর সামনে পায়চারি করে সময় কাটাতে লাগলেন।

বেশীক্ষণ ধৈর্য ধরতে হল না। সাড়ে নটা নাগাদ রাচিন এবং শোলাগা তরুণটি ফিরে এসে জানাল, বাইসনের খোঁজ পাওয়া গেছে। মাত্র চার মাইল দূরের এক জলাশয়ে তাদের আস্তানা। অবশ্য এদের মাইল জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। অনায়াসে এরা ২০/২৫ মাইল হেঁটে চলে যায়। তাই তাদের কাছে যা চার মাইল, তা শেষ পর্যন্ত সাত-আট মাইল হওয়া বিচিত্র নয়।

এন্ডারসন দেখলেন, হাতের মুঠোয় যখন সুযোগ পাওয়া গেছে, তখন অনর্থক সময় নষ্ট করা উচিত নয়। লাঞ্চ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তখনই তাঁরা রওনা দেবেন বলে ঠিক করলেন। যদি সংবাদ সঠিক হয়, তবে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবেন। ফিরে এসে কোন মতে খেয়ে অন্ধকার নামবার অনেক আগেই আবার তাঁরা পাকা সড়কে পেঁছাতে পারবেন।

এন্ডারসনের বন্ধুর কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। এন্ডারসনের একটা ভারী বোরের (·৪০৫) রাইফেল আছে। এই প্রচন্ড রোদে ঐ ভারী রাইফেল একটা বোঝা হবে মনে করে তিনি ওটা সঙ্গে না নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। তাছাড়া মার্কিন বন্ধুটির ভারী ক্যামেরা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলিও তো নিতে হবে।

রাচিনের এবং শোলাগা যুবকটির হিসাব মত চার মাইল যাওয়ার কথা। বনের ছায়ায় ছায়ায় তাঁরা প্রায় মাইল দুয়েক মত এসেছেন। নিস্তরঙ্গ বনভূমি। বিক্ষিপ্ত দুচারটি ক্লান্ত পাখীর ছাড়া-ছাড়া ডাক এবং ঝিঁ-ঝিঁ পোকার শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। এগুলি না থাকলে বনের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। যদিও ভয়ের কোন কারণ নেই, তবু রাচিন, কি জানি কেন, মাঝে মাঝে পেছনে তাকিয়ে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ রাচিন একবার পেছনে তাকিয়েই এন্ডারসনকে ফিসফিস করে বলল—'ডোরাই, আনমাই ভারাদু।' অর্থাৎ 'সাহেব, হাতি, আসছে।'

রাচিনের কথা মত এন্ডারসন চকিতে পেছনে তাকাতেই দেখতে পেলেন, বনের যে দিকটা ফাঁকা মতন, গাছগাছালি কম, সেদিক থেকে একটা হাতি সোজা এদিক পানে আসছে। দূরত্ব খুব বেশী হলেও আড়াই-শ গজের বেশী হবে না। তাঁদের উপস্থিতি জানা সত্ত্বেও হাতিটা যখন সোজা জোর কদমে এদিকেই আসছে, তখন তার উদ্দেশ্য যে খুব মহৎ নয়, সে কথা বুঝতে এন্ডারসনের মত অভিজ্ঞ শিকারীর এক মুহূর্তের বেশী লাগার কথা নয়। হাতি যতই বুনো হোক, মানুষ দেখলে পালাবেই। একমাত্র মত্ত না হলে মানুষকে ওরা এড়িয়েই চলে। তাই হাতিটার মতিগতি দেখে এন্ডারসনের খুব ভাল লাগল না।

হাতীটির উপস্থিতি এরা দুজন ছাড়া অন্য দুজন জানতে পারে নি। জানলে, শোলাগা যুবকটির কথা আলাদা, কিন্তু মার্কিন ফটোগ্রাফার ভয় পেয়ে কি করে বসতেন তা বলা যায় না। তাই এন্ডারসন আশ্রয়ের সন্ধানে চারিদিকে তাকালেন। আশে পাশে যেসব গাছ দেখা গেল, সেগুলি এত নিচু অথবা দুর্বল যে অনায়াসে হাতি নাগাল পাবে।

এদিক ওদিক তাকাতে প্রায় শ দুই গজ দূরে বিরাট একটা পাথরের চাঁই নজরে পড়ল। একমাত্র ওটাই পরিত্রাণের আশ্রয়স্থল বলে মনে হল এন্ডারসনের।

এন্ডারসন বন্ধুর পাশে এসে বললেন—'আমাদের হাতি তাড়া করেছে। মনে হচ্ছে এটা সেই পাগলটা। তুমি আমার সঙ্গে দৌড়োও। যে করেই হোক ঐ পাথরটার উপর আশ্রয় নিতে হবে।'

ভদ্রলোক একবার চকিতে পেছন দিকে তাকিয়ে দৌড়াতে আরম্ভ করলেন। ক্যামেরার বোঝা পাশের ঘাসের ঝোপে ছুড়ে ফেললেন। ছুড়ে ফেললেন অন্যান্য যন্ত্রপাতিও। রাচিন ও শোলাগা তরুণটিও মহাজন পন্থা অনুসরণ করে। তারপর শুরু হল মরণপণ দৌড়। কাঁটা, পাথর এবং ক্ষুর-ধার ঘাস উপেক্ষা করে সবাই দৌড়চ্ছে। এন্ডারসন একসময়ে পেছন ফিরে দেখলেন, হাতিটিও তার দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। এবার একটা বিষয় স্পষ্ট বোঝা গেল যে, হাতিটির মতিগতি কোনক্রমেই নিরামিষ পর্যায়ের নয়।

হাতির গতি যদি দৌড়ের উপর থাকে, তাহলে তা শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরের চাইতেও অনেক বেশী। শোনা গেছে সমতল কোন জায়গায় হাতি অনায়াসে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে দৌড়াতে পারে। এন্ডারসন যখন তাঁর অন্য তিনজন সংগীকে নিয়ে ঐ পাথরটার কাছে পোঁছালেন, তখন সেই মূর্তিমান দানব মাত্র এক শত গজ পেছনে। তখনো সে প্রাণপণে ছুটে আসছে।

পাথরটা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট। পাথরটার একটা দিক প্রায় পাঁচ-ছ ফুট উঁচু। ছোটখাট খাঁজ ছাড়া প্রায় খাড়া নেমে গেছে সে দিকটা। অন্য দিকে পাথরটা কিছুদূর ঢালু হয়ে গিয়ে আবার প্রায় খাড়া নেমে গেছে। সেদিকটাও প্রায় তিন ফুট উঁচু। তবে খাঁজ অনেক বেশী।

এন্ডারসন সবাইকে নিয়ে ঐ পাথরটার উপর গিয়ে দাঁড়ালেন। পরমুহূর্তেই দানবটি ঝড়ের গতিতে পাথরটার উঁচু দিকটায় যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু তার পক্ষে ঐ বিরাট দেহ নিয়ে পাঁচ ফুট ওঠা অসম্ভব। তাছাড়া ওর পক্ষে পা রাখবার বিন্দুমাত্র সুবিধাও নেই। কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করার পর শুঁড়টা সে বাড়িয়ে দিল এদের দিকে। রাগে, বিরক্তিতে এবং হতাশায় তখন সে কর্ণবিদারী আওয়াজ ছাড়ছে।

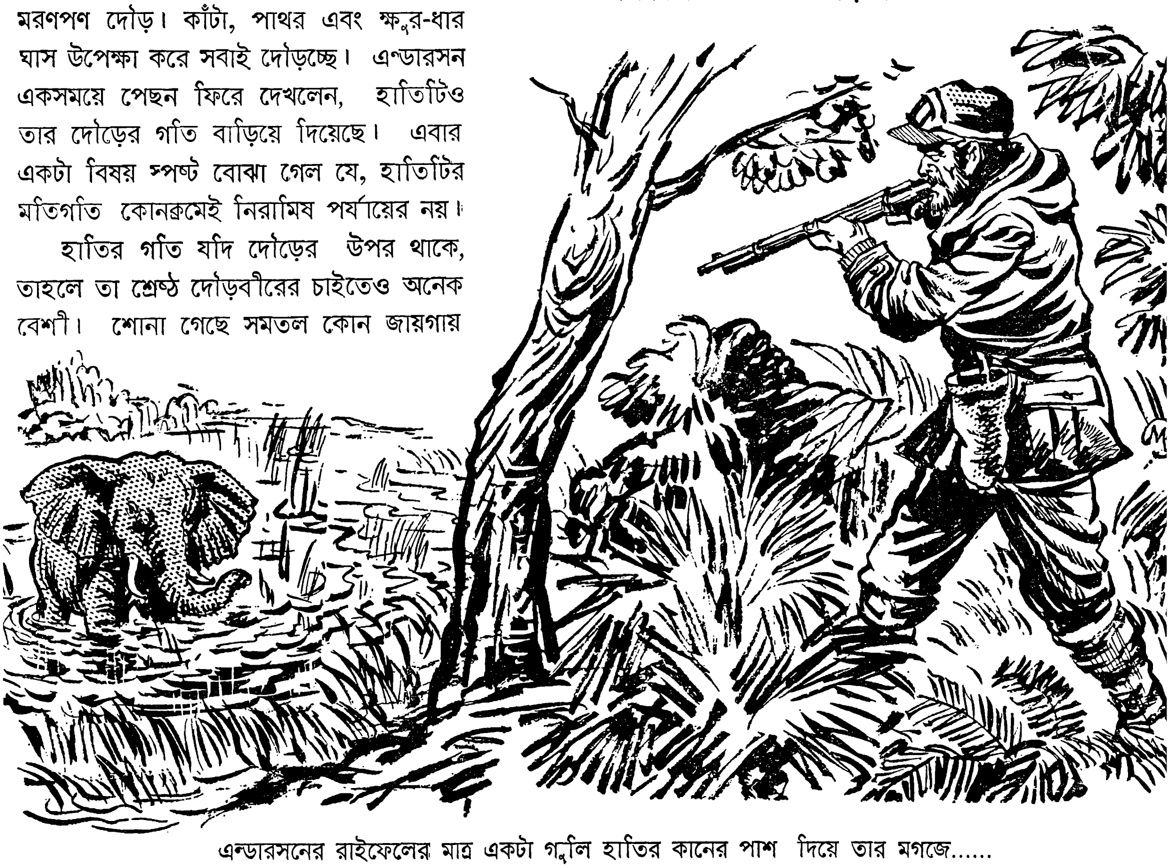

এন্ডারসনের রাইফেলের মাত্র একটা গুলি হাতির কানের পাশ দিয়ে তার মগজে......

এর পর হাতিটি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করল। তারপর তড়িৎবেগে পাথরটাকে বেষ্টন করে নিচু দিকে হাজির হল। দু-একবার চেষ্টা করার পর হাতিটি পাথরের চাতালের উপর উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে এণ্ডারসন তাঁর দলবল নিয়ে পাঁচ ফুটের দিক থেকে এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিচে। হাতিটি শুঁড় উঁচু করে তীব্র চীৎকার করতে করতে ছুটে এল উঁচু দিকটায়। ততক্ষণে তার ক্ষুদে শত্রুরা তার হাতের, মানে শুঁড়ের নাগালের বাইরে। এরা সন্তর্পণে অনেকটা ব্যবধান রেখে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

হাতিটি কিছুক্ষণ চেষ্টা করল এদিক দিয়ে নেমে শত্রুদের সামনা-সামনি মোকাবিলা করতে। কিন্তু তার ইচ্ছে থাকলেও সাহসে কুললো না। পাঁচ ফুট উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া মানে তার পা ভাঙ্গা। ক্রুদ্ধ হাতিটি শুঁড় তুলে রক্ত-জল-করা চীৎকারে বনভূমি কাঁপিয়ে তুলল।

এমনি ভাবে এদের সঙ্গে বার কয়েক ডাঙ্গাকুমীর খেলে হাতিটা নিজেই কাহিল হয়ে পড়ল। হাতি যখন নিচু দিক দিয়ে নেমে এদিকে আসে, তখন এরা মরণপণ করে উঁচু দিক দিয়ে পাথরের গা বেয়ে চাতালের উপর গিয়ে দাঁড়ায়। হাতি আবার ওদিক থেকে আক্রমণ করলে তারা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিচে।

রোদ তখন চড় চড় করে মাথার উপর চেপে বসেছে। গ্রীষ্মের দারুণ তাপে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার উপর রোদে তেতে উঠা চাতাল আরো কষ্টদায়ক। হাতির মত প্রাণীই যখন চাতালে উঠে একাদিক্রমে বিশ সেকেণ্ড পা চেপে রাখতে না পেরে সমান তালে নাচছে, এঁদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদর কারো পায়ে জুতা নেই। হাতির মত তারাও সমানে দুপায়ে নাচছে।

পাথর থেকে ৩০/৪০ গজ দূরে একটা বড় গাছ। হাতি এবার ঐ গাছের নিচে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝে সে এদের দিকে তেড়ে এসে আবার ধীর পায়ে গাছের কাছে ফিরে যাচ্ছে। অন্য সময় হলে হাতির এই আচরণ কৌতুক সঞ্চার করত।

আধ ঘন্টা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর হঠাৎ হাতিটি পেছন ফিরে বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এণ্ডারসন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর চারদিক দেখে শুনে নিচে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে যমদূতের মত আবার ওর আবির্ভাব দেখেই তাঁদের চোখ ছানাবড়া!

এরপর হাতিটি আবার বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর এঁরা নিচে নামলেন। শয়তানটির মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। এটা তার নতুন কোন চালাকিও হতে পারে। কিন্তু এবার বোঝা গেল, কালো শয়তানটি সত্যি সত্যি প্রখর রোদ সহ্য করতে না পেরে জলের খোঁজে গেছে। ঠাণ্ডা হয়ে, ভরপেট জল খেয়ে যদি সে পুনরায় ফিরে আসে, তবে নিশ্চয়ই রাত ভোর এদের এখানে আটকে রাখবে, না হয় সবাইকে শেষ করে ছাড়বে।

যখন বোঝা গেল, শয়তানটি আশে-পাশে নেই, তখন শুরু হল চারজনের মরণপণ দৌড়। এক ছুটে যখন এঁরা ক্যাম্পে ফিরে এলেন, তখন বেলা একটা।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে এণ্ডারসন একরকম না খেয়েই তাঁর ভারী রাইফেলটি নিয়ে রাচিন এবং যুবকটিকে নিয়ে ফের বের হলেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, শয়তানটি ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত পাথরটার কাছে আর আসবে না। এই সময়টুকু হাতে পেলে এণ্ডারসন পাথরটার উপর থেকেই হাতিটাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান জানাতে পারবেন।

কিন্তু তার চাইতে ভাল হয় যদি হাতিকে ডোবার মধ্যেই পাওয়া যায়। রাচিন এণ্ডারসনকে সেই বুদ্ধিই দিল। পাথরটার কাছে এসে চারদিক পরীক্ষা করে বোঝা গেল, হাতিটি ওখানে ফিরে আসেনি। অর্থাৎ তখনো সে জলেই রয়েছে। যুবকটিকে পথপ্রদর্শক করে এঁরা সন্তর্পণে এগোতে লাগলেন। মাইলখানেক যাওয়ার পর দেখা গেল একটা ছোট পাহাড় নিচু দিকে নেমে গেছে। নিচেই খাদ। আর এই খাদের মধ্যে চারপাশে ঘন বনের মাঝখানে একটা বেশ বড় ডোবা। তাতে কিন্তু জল নেই। জল যা ছিল, তা হাতির স্নান করার দাপটে সব কাদা হয়ে গেছে। হাতি যে এখান থেকে কিছু আগেই উঠে গেছে তা দেখেই বোঝা গেল।

খাদ ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল, হাতি নালা থেকে জল পান করে উপরে উঠে বনের মধ্যে ঢুকেছে। ওর পায়ের ছাপ এবং গাছের ডালপালার ভাঙ্গা টুকরো পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় সে গাছের ডাল থেকে ছাল ছাড়িয়ে খেয়ে শুধু ডালগুলি ফেলে রেখেছে। ডালের গা থেকে কষ তখনো শুকোয় নি।

মাইলখানেক যাওয়ার পর সামনেই ডাল ভাঙ্গার আওয়াজ হল। তিনজনেই সতর্ক হলেন। একটা বিষয় স্থির হওয়া গেল যে, শয়তানটি এদের অবস্থান জানতে

পারে নি। শয়তানটি যে এদের থেকে অন্তত তিন চারশ গজ দূরে ছিল, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। এণ্ডারসন আগে, রাচিন তাঁর পেছনে এবং শোলাগা যুবকটি শেষে। এইভাবে তিনজন সন্তর্পণে এগোতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বার দুয়েক ডাল ভাঙ্গার আওয়াজ এল। ঠিক কোন্ দিক থেকে আওয়াজ আসছে ঠিক করে নিয়ে এবং দূরত্ব আন্দাজ করে তাঁরা এগোতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদেই ডান দিকে ডাল ভাঙ্গার আওয়াজ শোনা গেল।

এণ্ডারসন থমকে দাঁড়ালেন। হাতিটা কি ওপাশে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নালার দিকে নেমে গেল? তেমন আওয়াজ না হলেও তাঁর যেন তাই মনে হল। ধীর পায়ে এগিয়ে তাঁরা বুঝতে পারলেন, একটু আগেই সেখানে হাতিটি দাঁড়িয়ে ছিল। অনুকূল বাতাসে এদের গায়ের গন্ধ পেয়ে পালিয়েছে। হাতি যতই হিংস্র হোক, তাকে কেউ খুঁজছে এ কথা বুঝতে পারলে আক্রমণের পরিবর্তে সে পলায়নই শ্রেয় মনে করে।

কিছুদূর এগিয়ে একটা বাঁকের মুখে হঠাৎ হাতিটার পেছন দিক দেখা গেল। বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নালা দিয়ে সে হেঁটে চলেছে নিচের গভীর বনের দিকে। চোখের নিমেষে সে বাঁকের আড়ালে চলে গেল।

বাঁকটা সন্তর্পণে ঘুরতে গিয়েই এণ্ডারসন দেখতে পেলেন, প্রায় শ'চারেক গজ আগে হাতি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যেন অদ্ভুতভাবে দুলছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওকে পর্যবেক্ষণ করে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন তিনি। এবং কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখা গেল, হাতিটা একটা জলা জমির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় চোরাবালির মধ্যে আটকে গেছে। তার চারটি পা-ই পেট পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে গেছে। বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। এমন কি তার চোখ থেকে সেই হিংস্র, ক্রূর দৃষ্টিও উধাও হয়ে গেছে। পরিবর্তে এসেছে সন্ত্রস্ত অচঞ্চল দৃষ্টি।

এণ্ডারসনের রাইফেলের মাত্র একটা গুলি হাতির কানের পাশ দিয়ে তার মগজে প্রবেশ করল। প্রচণ্ড গতিতে শয়তানের শুঁড়টা কাদার মধ্যে আছড়ে পড়ল, তারপর নিজেও সে হেলে পড়ল কাদার উপর।

সংবাদ-বিচিত্রা ● খুনী রোবট

ভূতের ওঝা ভূতের হাতেই মরে—এ রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল রোনাল্ডের ভাগ্যে।

১৯৩২ সাল। বিজ্ঞানী রোনাল্ড আপন মনের খেয়ালে একটি যান্ত্রিক মানুষ —যাকে বলে 'রোবট্'—তৈরি করলেন নিজের ল্যাবোরেটারীতে। দেখতে অদ্ভুত রকমের এই রোবট্—মধ্যযুগের বর্মাবৃত কতকটা। কিন্তু স্থবির নয়, সচল। হাতুড়ী পেটা, গাছ কাটা, গদা চালান প্রভৃতি পরিশ্রমের কাজ সে নির্বিবাদে চালিয়ে যেতে পারত। সে বছরই চিকাগোর এক মেলায় এই যান্ত্রিক মানুষটিকে কড়া মেজাজে ঘুরতে দেখে সবাই ভীত এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিল।

একদিন বিজ্ঞানী রোনাল্ড ল্যাবোরেটারীতে কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ ঝন্ ঝন্ শব্দে কেঁপে উঠলেন তিনি। পেছনে তাকিয়ে দেখলেন তাঁরই নির্মিত রোবট্ গদা হাতে একের পর এক যন্ত্রপাতি ভাঙছে। আত্মরক্ষা করবার আগেই রোবটের গদা এসে পড়ল রোনাল্ডের মাথার উপর—হায় বিজ্ঞানী! ভূতের ওঝা ভূতের হাতেই মরলেন।

—সুভাষ নাগ

ঘাবড়াও মাৎ!

শৈলেনকুমার দত্ত

ছেলেদের মধ্যে যারা বাড়িতে-বাইরে ভীষণ দুষ্টুমি করে, মা-বাবার কাছে দুষ্টুমি করার জন্যে বকুনি খায়, তাদের বলি—মাভৈঃ, ঘাবড়াও মাৎ! আজ অনেকগুলি দুষ্টু ছেলের কথা শোনাব।

বাড়িতে, সভা-সমিতিতে এবং স্কুলে আমরা যে সমস্ত মনীষীর ছবি টাঙানো দেখি, যাঁদের জন্ম বা মৃত্যুদিনে মালা দেই আমরা, তাঁদের অনেকে ছেলেবেলায় যে কী ভীষণ দুষ্টু ছিলেন, তা শুনলে অবাক হতে হয়। ছেলেবেলায় তাঁরা মা-বাবাকে জ্বালাতন করে মারতেন।

শ্রীকৃষ্ণের কথা তোমরা শুনেছ। ইনি ছেলেবেলায় ভীষণ দুষ্টু ছিলেন। রান্নাঘরে ঢুকে ননী চুরি করে খেতেন। বড় হবার পরেও গোপ-গোপীদের ঘরে ঢুকে দুধের হাঁড়ি ভেঙে দিতেন।

শ্রীচৈতন্য দেব কি করতেন, জান? গঙ্গায় চান করতে গিয়ে ব্রাহ্মণদের নৈবেদ্য কেড়ে খেয়ে নিতেন!

মহাকবি শেক্সপীয়রের নাম তোমরা শুনেছ—'ম্যাকবেথ' 'হ্যামলেট,' 'কিং লিয়ার'প্রভৃতি অমর নাট্যকাব্য রচনা করে যিনি অমর হয়েছেন। এই শেক্সপীয়রও কিন্তু ছেলেবেলায় মোটেই শান্ত ছেলে ছিলেন না। তাঁর দুরন্তপনা শুধু বাড়িতেই সীমাবদ্ধ থাকত না, সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে তিনি অন্যের জঙ্গলে ঢুকে হরিণ শিকার করতেন। বড় হয়ে তাই এই হরিণ শিকারের গল্প তিনি তাঁর নাটকেও উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থও ছেলেবেলায় অসম্ভব দুরন্ত ছিলেন। তাঁর দুষ্টু বুদ্ধির অন্ত ছিল না। গ্লাস-প্লেট-ছবি-আয়না সব তিনি ভেঙে চুরমার করে দিতেন।

বিলেতে একসময় পেলী নামে বিখ্যাত এক ডাক্তার ছিলেন। সে সময়ে তাঁর সমকক্ষ ডাক্তার সমগ্র বিশ্বে ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি ছেলেবেলায় এত দুষ্টুমি করতেন যে, পাড়ার লোকেরা সারা রাত ঘুমোতে পারত না।

আমাদের বিদ্যাসাগর ছোটবেলায় বড় বেশী দুরন্ত ছিলেন। তিনি সুযোগ পেলেই কারও বাগানে আম, কারও বাগানে জাম পেড়ে বেড়াতেন। শুধু কি তাই! বাইরে কারও জামা-কাপড় শুকোতে দেখলে উনি গিয়ে গোবর মাখিয়ে দিতেন, সুযোগ পেলে পায়খানা করেও পালাতেন।

শুধু বিদ্যাসাগর কেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং বিবেকানন্দও কি কম দুষ্টু ছিলেন! ওঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে বাবা-কাকার গড়গড়ায় তামাকও খেয়ে নিতেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ শান্তশিষ্ট বালক ছিলেন না,—অত্যন্ত চঞ্চল ছিলেন বলে ওঁর বাবা ওঁকে লোকের জিম্মায় রেখে দিতেন।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা নামে একটা বই-এর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। সে বইটি যিনি লেখেন, সেই কালীপ্রসন্ন সিংহ কেমন দুষ্টু ছিলেন, জান? উনি ছিলেন জমিদারের ছেলে, ওঁদের বাড়িতে নানান লোকজন আসত। কারো মাথায় টিকি থাকলে, উনি তা টেনে দিয়ে পালাতেন।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও ভীষণ দুষ্টু ছিলেন। তাঁর দুষ্টুমিতেও তাঁর বাড়ির লোকেরা পাগল হয়ে উঠতেন।

বাঘা যতীন ছোটবেলায় অসম্ভব দুষ্টু আর দুরন্ত ছিলেন। মায়ের সঙ্গে নদীতে চান করতে গিয়ে জলে সাঁতার কেটে দূরে চলে যেতেন। নদীতে কুমীর থাকলেও জল থেকে উঠতে চাইতেন না।

ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক স্যামুয়েল জনসন মাকে ভীষণ জ্বালাতন করতেন। রেহাই পাবার জন্যে মা করতেন কি, জনসনকে কেবল পড়া মুখস্থ করতে দিতেন। কিন্তু তা দিলে কি হয়! জনসন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। একবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যেত। আর তারপরেই আবার তিনি মা-কে জ্বালাতন করতে উঠে পড়ে লাগতেন।

দুষ্টু ছেলেদের কথা বা খ্যাতিমানদের ছেলেবেলার দুষ্টুমির কাহিনী তো শুনলে। কিন্তু একটা কথা কি জান? দুষ্টুমি করলে কি হয়—পড়াশোনায় বা নিজেদের কাজে তাঁরা যখন বসতেন, তখন কিন্তু কোন দুষ্টুমি থাকত না, কাজে এতটুকু ফাঁকি দিতেন না তাঁরা, তন্ময় হয়ে কাজে ডুবে থাকতেন।

তাই না তাঁরা এত বড় হতে পেরেছিলেন!

রহস্যময় সেই বাড়িটা

॥ পূর্বানুবৃত্তি ॥

আজ থেকে প্রায় বছর পনের আগে দুর্জয় এক শীতের রাতে মহানগরীর এক অত্যন্ত পুরোনো বাড়ির সামনে একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সারা বাড়িটা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। একতলার চায়ের দোকানের মালিক হাজরা শুধু জেগে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মাথায় হ্যাট, চোখে নীল চশমা, পরনে স্যুট নৈশ আগন্তুক হাজরার কাছে এসে জানতে চাইল যে, তার দাদা বাড়িওয়ালা বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস বাড়িতে আছেন কিনা। আছেন জেনে আগন্তুক ভেতর দিকে পা বাড়ায়। গভীর রাত। ছাদ থেকে কাদের যেন উত্তেজিত কণ্ঠস্বর হাজরার কানে আসে। গায়ে চাদর জড়িয়ে সে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে গিয়ে পৌঁছয়। যেখানে বিপত্নীক বিষ্ণু বিশ্বাস একা থাকেন ছাদের সেই চিলেকোঠার বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে তখন ভেসে আসছে বিষ্ণুবাবুর কণ্ঠস্বর: 'তুমি আবার এসেছো বৈকুণ্ঠ? জীবনের পরপার থেকে কেন তুমি এসে আমাকে ভয় দেখাও? আমি কি করেছি তোমার?' প্রত্যুত্তরে শোনা যায় মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর: 'হায়রে হতভাগ্য মানব! তুমি কি করেছ তা তুমি জাননা! শোন বিষ্ণু বিশ্বাস, লটারির টিকিটখানা আমার চাই। ওটা না পাওয়া অবধি আমার শান্তি নেই!' বিষ্ণু-বাবু প্রতিবাদ করে ওঠেন। তারপর তাঁর আর্ত চীৎকার ভেসে আসে। বাড়ির লোকজন সব ওপরে এসে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। বিষ্ণুবাবুর বালক-ভৃত্য কালীচরণ ছাদে শোয়। তার ও হাজরার মুখে ঘটনাটা শোনবার পর 'মিত্রনিবাস' মেসের মালিক হেমচন্দ্র দে আর লটারির টিকিট বিক্রেতা টি. পি. রায় যথাক্রমে ডাক্তারকে ও থানায় ফোন করতে যান। আগে আসেন ডাক্তার বাসু! এতক্ষণ ধাক্কা দিয়েও যে দরজা খোলা যায়নি, ডাক্তার বাসু হাত রাখতেই তা খুলে যায়। ঘরের ভেতরকার দৃশ্য দেখে সবাই শিউরে ওঠেন। ঘরের মেঝেয় বিষ্ণুবাবু চিত হয়ে পড়ে আছেন, চোখ দুটো অর্ধনিমীলিত, মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। নাড়ি পরীক্ষা করে হর্ষধ্বনি করে ওঠেন ডাক্তার, 'থ্যাংকস্ গড! এখনো বেঁচে—শীগগির জল এক ড্রাম!' সেবা-শুশ্রূষার পর বিষ্ণুবাবুর জ্ঞান ফিরে আসে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন স্থানীয় থানার ও. সি. গোপীজীবন ভড়। হাজরার মুখে সব শুনে তিনি মন্তব্য করেন, 'এ যে দেখছি ভূতুড়ে কাণ্ড।' কে যেন এই সময় বলে ওঠেন, 'সত্য ঘটনা গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর।' বক্তার নাম চন্দ্রকালী দাস, ভূত নিয়ে লেখেন টেখেন। ও. সি. লটারির টিকিট বিষয়ে জানতে চাইলে টি. পি. রায় তিনদিন আগেকার এক ঘটনা বিবৃত করেন। তাঁর কাছ থেকে লটারির টিকিট কিনে যে ভদ্রলোক আড়াই লাখ টাকার ফার্স্ট প্রাইজ পান, এই বাড়িরই পুরনো বাসিন্দা সেই অমৃতলাল ধরগুপ্তকে সম্বর্ধনা জানবার উদ্দেশ্যে তিন দিন আগে এই বাড়ির দোতলায় তাঁর ঘরে টি. পি. রায় এক জলসা করেন। সভাপতির ভাষণে বিষ্ণুবাবু জানান যে, তিনি নিঃসন্তান ও আত্মীয় কেউ নেই। বৈকুণ্ঠ নামে এক ভাই ছিল, বছর দশেক আগে সেও গত হয়েছে। অমৃতকে তিনি পোষ্য নেবেন। টি. পি.রায় বললেন, অমৃতবাবু যেন তাঁর লটারির টিকিটখানা বিষ্ণুবাবুর নিরাপদ আশ্রয়ে জমা রাখেন।

টি. পি. রায়ের কাহিনী শেষ হল। বিষ্ণুবাবু কেঁদে ফেললেন, 'অমৃতের কাছে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে!' চন্দ্রকালীবাবু ও হেমবাবু দুজনেই মন্তব্য করলেন যে, এই ভুতুড়ে ব্যাপার সমাধানের জন্যে একজন ভালো ওঝা ডাকাই শ্রেয়ঃ। ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলেন গীটার সেন্টার-এর প্রিন্সিপ্যাল সুবীরা মিত্র। শ্রীমতী মিত্র জানালেন যে, ভূতের বদলে সমস্ত ব্যাপারটা মানুষেরই কারসাজি; কারণ লটারির টিকিটের লোভে ভূতের আমদানী অবিশ্বাস্য। ও. সি. সবাইকে সাবধান থাকতে বলে বিদায় নিলেন। সেইদিনই সন্ধ্যায় দোতলার গীটার সেন্টার-এর ঘরে সুবীরা দেবী গীটার বাজাচ্ছেন, এমন সময় বৈকুণ্ঠ বিশ্বাসের আবির্ভাব হল। তার হাতে একটি কালো রঙের ফিতে। বৈকুণ্ঠ বিশ্বাস বললে, 'প্রবাদ আছে অতি চালাকের গলায় দড়ি। এই হচ্ছে সেই দড়ি অতি চালাকির খেসারত হিসেবে যা আপনাকে এখন পরতে হবে। আপনি থাকলে এই দড়ি আমাকেই হয়তো একদিন পরতে হতে পারে ভেবে আপনাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হচ্ছে। আপনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, ভূতটূত সব ভুয়ো—মানুষেরই সাজানো।' বলতে বলতে সুবীরার গলায় ফিতের গিঁট পরিয়ে বৈকুণ্ঠ বিশ্বাস টান মারতে যাবে, এমন সময় কে যেন বলে উঠল, 'কাজটা কি ভালো হচ্ছিল স্যাঙাত!' বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়ায় বৈকুণ্ঠ বিশ্বাস, বক্তাকে লক্ষ্য করে বলে, 'ফের তুই জ্বালাতে এসেছিস! ভালো চাস তো—'

রহস্যময় সেই বাড়িটা

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥

কাহিনী : দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ● চিত্ররূপ : নারায়ণ দেবনাথ

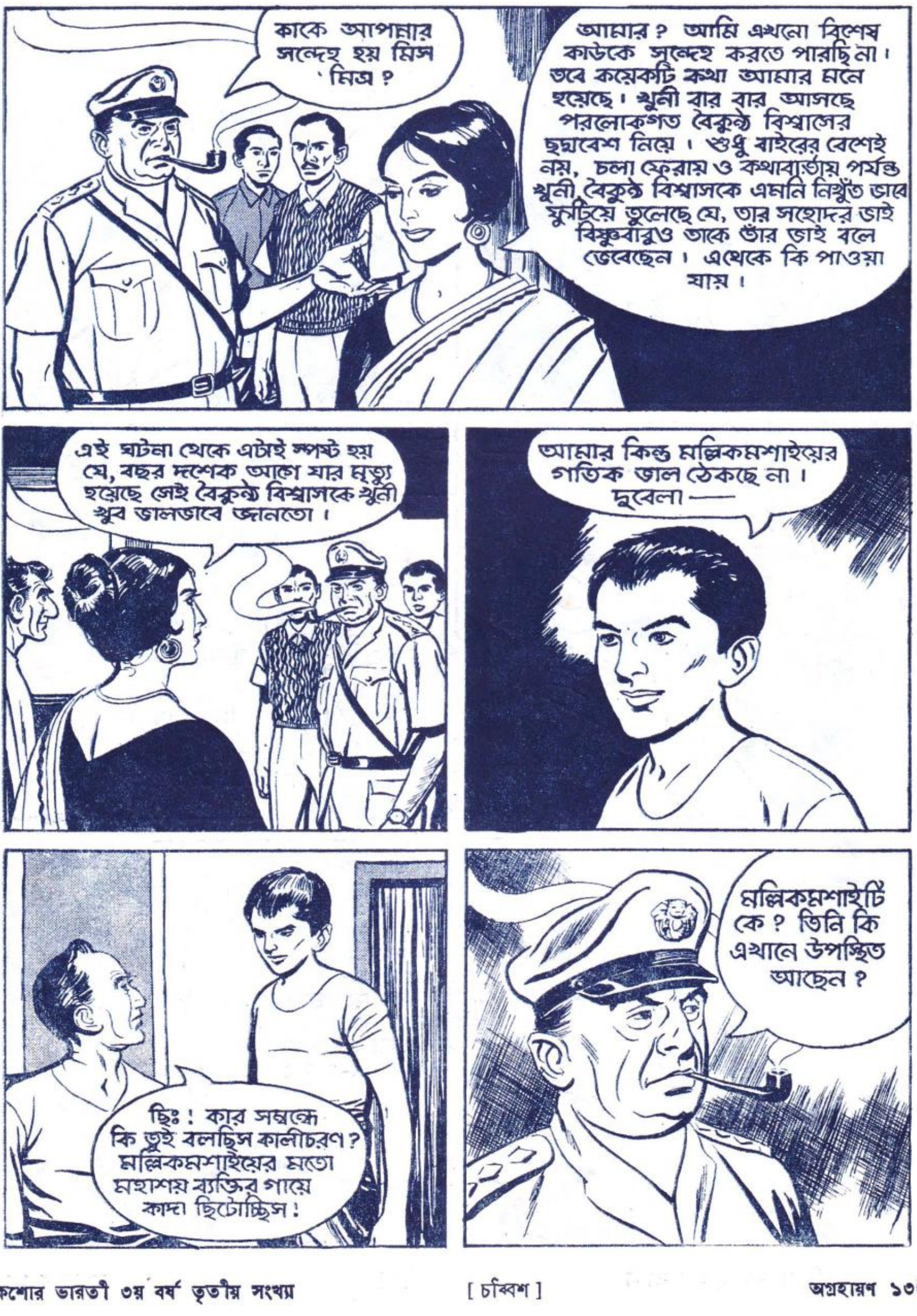
কাকে আপনার সন্দেহ হয় মিস মিত্র ?
আমার ? আমি এখনো বিশেষ কাউকে সন্দেহ করতে পারছি না। তবে কয়েকটি কথা আমার মনে হয়েছে। খুনী বার বার আসছে পরলোকগত বৈকুণ্ঠ বিশ্বাসের ছদ্মবেশ নিয়ে। শুধু বাইরের বেশেই নয়, চলা ফেরায় ও কথাবার্তায় পর্যন্ত খুনী বৈকুণ্ঠ বিশ্বাসকে এমনি নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যে, তার সহোদর ভাই বিষ্ণুবাবুও তাকে তাঁর ভাই বলে ভেবেছেন। এথেকে কি পাওয়া যায়।
এই ঘটনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, বছর দশেক আগে যার মৃত্যু হয়েছে সেই বৈকুণ্ঠ বিশ্বাসকে খুনী খুব ভালভাবে জানতো।
আমার কিন্তু মল্লিকমশাইয়ের গতিক ভাল ঠেকছে না। দুবেলা —
ছিঃ : কার সম্বন্ধে কি তুই বলছিস কালীচরণ ? মল্লিকমশাইয়ের মতো মহাশয় ব্যক্তির গায়ে কাদা ছিটোচ্ছিস !
মল্লিকমশাইটি কে ? তিনি কি এখানে উপস্থিত আছেন ?

না, উনি নিচে আছেন। দোতলায় মডার্ন ড্রাই ক্লিনার্স নামে যে লণ্ড্রী আছে, তুতুবাবু মানে তুতনাথ মল্লিক তার মালিক। জামাকাপড় কাচে ভারী চমৎকার। খালি আমার সালুখানারই যা বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল একবার।
সালু?
হ্যাঁ, সালু। আমার 'কিম্ভূত গোভূত' বইখানার বিজ্ঞাপন, আর্টিস্টকে দিয়ে সালুর ওপর লিখিয়ে নিয়ে মল্লিককে দিয়েছিলাম ইস্তিরি করতে। দুঃখের কথা কি বলব মশাই, মল্লিক বেছে বেছে এক আনাড়ীকে দিয়েছিল সেটা, সে ব্যাটা পুড়িয়ে-টুড়িয়ে গোল্লায় দিলে! বইখানা অবিশ্যি কেটেছিল দারুণ — সাত দিনেই সাতটা এডিশান!
খালি নিজের গুণগান!
কালীচরণকে একবার জেরা করলে হয় না স্যার?
ওই গোমুখ্যুটাকে জেরা করে কি লাভ? আমার একখানা বইয়ের নামও পর্যন্ত শোনে নি!
আপনি চুপ করুন।
লাভ আছে কিনা সেটা আমি বুঝব। কালীচরণ, তুমি কাল সকালে মিঃ ভড়ের সঙ্গে একবার লালবাজারে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। মিস মিত্র আপনি খুব সতর্ক থাকবেন। প্রথমবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে খুনী দ্বিগুণ আক্রোশ নিয়ে ওত পেতে রয়েছে সুযোগের অপেক্ষায়। আপনারা সকলেই সাবধানে থাকবেন।

কাল রাতে উৎপাতে ঘুমুতেই পারিনি রে কালীচরণ! ভাবছি ঘন্টাখানেক ঘুমিয়ে নিয়ে রান্না চড়াব। তোরও তো কাল রাত জাগা গেছে। ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে ছাতে গিয়ে তুইও ঘন্টাখানেক গড়িয়ে নিগে যা। আর শোন্, ইঁদারা থেকে দু'বালতি জল মনে করে তুলে দিস।
ঘন্টাখানেক বাদে।
জল দু বালতি কি হলো রে কালীচরণ?
আনতিছি কত্তাবাবু!
হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো---
পার কর আমারে-এ-এ
কে!

[চলবে]

দীননাথ কাশ্যপের

ধারাবাহিক উপন্যাস

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ● পঞ্চম পর্ব

॥ চার ॥

জুরা রোজই শিকারে বেরোয়। আবহাওয়া যাই থাক—ঝড় হোক, তুষারপাত হোক আর হিমঝঞ্ঝা হোক—উটের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে গোরাকে সংগে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। মহানন্দে টীক ছোটে আগে আগে।

কারা-কুল হ্রদের ধারে গিরিশ্রেণীর ওপরে দলে দলে ছাগলের পাল এসে জমা হচ্ছে, পামীরের অন্য অংশে পাড়ি দেওয়াই তাদের মতলব। ওরা সরে পড়ার আগেই যতদূর সম্ভব মাংসের ব্যবস্থা করতে জুরা উঠে পড়ে লেগেছে। আড়াই শো ভেড়া বা ছাগলের মাংসের ব্যবস্থা করতে পারলে কজুবে তাকে একটা 'মসার' বন্দুক দেবেন কথা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে এক শো আশিটার ব্যবস্থা হয়েছে।

ভোরের আলো তখনো ফোটে নি, গোরাকে নিয়ে জুরা কিজিল-আর্ট গিরিবর্ত্মের দিকে রওনা হলো। কিজিল-আর্ট গিরিবর্ত্ম পার হলেই মারকান-সু-মরুভূমি। কারা-কুল হ্রদ ছাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে পর্বত-শ্রেণীর ওপরে ছাগলের পাল চরছে। শিকারীদের দেখেই তারা সরে গেল। জুরার কিন্তু কোনা তাড়া নেই।

সন্ধ্যার দিকে তারা এসে পৌঁছলো এক জনহীন পরিত্যক্ত কুঠরিতে। গ্রীষ্মকালে ফারঘানা উপত্যকা থেকে কাশগড়িয়ায় যাবার পথে কাফেলাবাহিনী সাধারণতঃ এখানে রাতের জন্য আশ্রয় নেয়। ওরাও আশ্রয় নিলে সেখানে।

পথে আসার সময় জুরা একটা ছাগল শিকার করেছিল। পাত্রে রান্না হচ্ছে তার মাংস। জুরা বললে গোরাকে,—কাল দেখবে ছাগল-শিকার কাকে বলে। 'ভল্লুক' পর্বত চেন তো? রাত্রিবেলায় সেই পর্বতে উঠে 'চক্ষু' পাহাড়ের কাছে গিয়ে আমি লুকবো। ভোরের আলো ফুটতেই তুমি দেখবে, ছাগলের পাল নীচে চরছে। তোমার কাজ হবে, ওদের সেখানে থেকে তাড়িয়ে আমার দিকে পাঠানো। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা?

হ্যাঁ।—গোরা ঘাড় নাড়ে।

পর দিন। ভোরের আলোর আভাস জাগছে। মারকান-সু'র ওপরে কুয়াশা জমে আছে। দূর থেকে আসছে নেকড়ের চিৎকার। গোরা রওনা হয়। টীককে নিয়ে জুরা রাত থাকতেই বেরিয়ে গেছে।

গোরা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে একটা টিলার পেছনে গিয়ে আত্মগোপন করে। কুয়াশা কাটতে শুরু করেছে। কাছেই দলে দলে চরছে ছাগলের পাল। চার-দিক আরো পরিষ্কার হতে গোরা বন্দুক ছুড়লো। একটা ছাগল মারা পড়লো। বাদবাকী গোটা দলটা পর্বত বেয়ে ছুটলো ওপরের দিকে।

ছাগলটার যথোচিত ব্যবস্থা করে গোরা চুপচাপ বসে রইল—কি ঘটে দেখার জন্য। বহু দূরে ছাগল-গুলোকে দেখাচ্ছে ধূসর বিন্দুর মতো। দুর্লঙ্ঘ এক খাড়াইয়ের ধারে এসে তারা হাজির হয়েছে।

খাড়াইয়ের গা বেয়ে অতি সরু একটা থাক চক্ষু পাহাড় পর্যন্ত গেছে। থাকটা এত সরু যে, প্রায় নজরে আসে না। ছাগলের পাল লাইন বেঁধে একের পর এক সেই সরু থাক বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে।

পরক্ষণে রাইফেলের ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পায় গোরা। সামনের ছাগলটা শূন্যে লাফ মেরেই নীচে গড়িয়ে পড়লো। আবার এল গুলির শব্দ—আবার... আবার...আবার...

ছাগলের পাল পড়ছে একের পর এক। পেছনের গুলো পিছু হটার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেদিকে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে টীক।

সামনের থাক বেয়ে ওপরে ওঠা ছাড়া ছাগলের দলের গত্যন্তর নেই। কিন্তু ওপর থেকে সমানে জুরার গুলিবৃষ্টি চলেছে। নিরুপায় ছাগলের দল শেষে গুলিবৃষ্টির মধ্যেই জুরার পাশ কাটিয়ে পালাতে শুরু করলো।

গোরার ভারিক্কী ভাব ইতিমধ্যে কোথায় উবে গেছে! নেচেকুঁদে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, বগল বাজিয়ে, গলা ফাটিয়ে সে চিৎকার করে চলেছে,—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ! দেখে যারে দেখে যা, জুরার শিকার দেখে যা! এক সকালেই এত ছাগল, দেখে যারে দেখে যা!

রুদ্ধশ্বাসে সে ছুটলো ওপর দিকে। একুশটা ছাগল মারা পড়েছে। জুরা কিন্তু এত বড় শিকারেও খুশী নয়। বিষম উত্তেজিত সে, চিৎকার করে বললে গোরাকে,—যাও, পর্বত থেকে ওদের তাড়িয়ে নীচে নামাও। আমি স্মাগলার্স গিরিবর্ত্মে যাচ্ছি। ছাগলের পাল আবার আমার দিকেই আসবে।

গোরা ছুটলো। শীগ্‌গীরই ধরে ফেললে ছাগল-পালের নাগাল, তাদের তাড়িয়ে নামাল গিরিবর্ত্মের দিকে।

ছাগলের দল আবার সোজা ছুটছে জুরার দিকে। গোরা তাকিয়ে থাকে। ছাগলগুলো জুরার খুব নিকটে। এসে গেছে। এইবার—এইবার—

কিন্তু কী ব্যাপার! জুরা এখানো গুলি ছুড়ছে না কেন?

গোরা হতভম্ব। গুলি ছুড়ে সে জুরাকে সংকেতও করলো। কিন্তু বৃথা চেষ্টা—জুরার পাত্তা নেই। ছাগলের পাল ধীরে সুস্থে পাহাড় অতিক্রম করে চলে গেল। দুঃখে ক্ষোভে হতাশায় বসে পড়লো গোরা।

এদিকে জুরা কিন্তু সবই দেখছে, সংকেতও শুনেছে। তবু সে নিশ্চুপ। অদ্ভুত এক বিস্ময়কর দৃশ্য তার চোখের সামনে তখন উদ্ঘাটিত হচ্ছে। আর তাই গুলির ছোঁড়ার ইচ্ছা তাকে দমাতে হয়েছে অনেক কষ্টে।

নীচে—বহু-বহু নীচে দুজন ঘোড়সওয়ার পাহাড়-সারির ভেতর দিয়ে কিজিল-আর্টের দিকে আসছে আর পাহাড়সঙ্কুল পথ ধরে তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে তিনজন পার্টিজান। ঘোড়সওয়ার দুজনকে ওরা দেখতে পায়নি মনে হচ্ছে। জুরা ঘোড়া তিনটে চিনতে পারে—প্রথমটা কজিৎজ্‌কির সাদা রঙের ঘোড়া, দ্বিতীয়টা শরফের কটা রঙের আর তৃতীয়টা আখমেদের তামাটে রঙের।

জুরা দেখে, পার্টিজান তিনজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, আর শরফ ও আখমেদকে সেখানে রেখে কজিৎজ্‌কি এগিয়ে গেল ঘোড়ার পিঠে।

ছাগলের পাল জুরাকে অতিক্রম করে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। জুরার হাত নিশপিশ করতে থাকে, কিন্তু নিজেকে সে সংযত রাখে অনেক কষ্টে। পার্টিজান ও ঐ লোক দুটোর গতিবিধি সে লক্ষ্য করছে রুদ্ধশ্বাসে। হঠাৎ গোরার বন্দুকের শব্দে শরফ ও আখমেদ কজিৎজ্‌কির পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে।

সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার দুজন সীমান্ত পার হয়ে এসেছে, বোঝা যায়, গুলির শব্দে তারাও চকিত হয়ে উঠলো, রাইফেল নিয়ে তৈরী হলো মোকাবিলা করার জন্য।

শরফ ও আখমেদ কজিৎজ্‌কিকে ধরে ফেলেছে। কিন্তু কজিৎজ্‌কি হাত নেড়ে আবার তাদের পেছনে সরে যেতে বলছে।

দূরে একটা হাতিয়ার ঝলসে উঠলো। আখমেদ দেখতে পেয়েছে মনে হয়। সে গুলি ছুড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব এল আগন্তুকদের কাছ থেকে।

পার্টিজানদের হাত-পা নাড়া দেখে জুরা বুঝতে পারে, দু দলে ভাগ হয়ে ঘুরে উভয় দিক থেকে আগন্তুকদের বেড় দেবার পরামর্শ দিচ্ছে আখমেদ, কিন্তু কজিৎজ্‌কি হুকুম দিচ্ছে সোজা যেতে। তিনজনেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। আখমেদ টুপিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে রাইফেল উঁচিয়ে সোজা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

জুরা ছটফট করে ওদের সাহায্য করার জন্যে—বিশেষ করে আখমেদের পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু বহু দূরে উঁচুতে রয়েছে সে।

কজিৎজ্কি যাচ্ছে আখমেদের সঙ্গে। জুরা দেখে, অপর পক্ষের বুলেটগুলো আখমেদের চারপাশে মাটিতে এসে বিঁধছে, ধুলো উড়ছে বুলেটের ঘায়ে। কিন্তু কজিৎজ্কির ধারে কাছে কোন বুলেট পড়ছে বলে মনে হয় না। শরফ লুকিয়েছে একটা পাহাড়ের পেছনে।

জুরা এবার ঢাল বেয়ে ছুটলো নীচের দিকে। হঠাৎ সে ক্ষণেক থমকে দাঁড়ায়। আখমেদ উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। শরফ দৌড়ে গেল তার দিকে। তারপর সে ও কজিৎজ্কি ধরাধরি করে আখমেদকে টেনে তুললো ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়াগুলো যেভাবে পিছিয়ে গেল, তাতে জুরার সন্দেহ রইল না যে, আখমেদের জীবন শেষ হয়ে গেছে। দুঃসহ রাগে ও দুঃখে দাঁতে দাঁত পেষে সে।

তীক্ষ্ন সরু মেয়েলী কণ্ঠে কি যেন বললে জবাবে। সে ভাষাও দুর্বোধ্য। জুরা শুধু বুঝতে পারে একটা নাম —ইমাম বল্‌বক!

মোটাসোটা উজবেকটা এক পায়ের বুটজুতো খুলে ফেললে, চিঠিখানা তার মধ্যে লুকিয়ে রেখে আবার পরে নিলে জুতোটা।

হঠাৎ তাদের কানে এল,—খবরদার, নড়বে না!

চকিতে ফিরে দাঁড়াতেই তারা দেখে, পাশের পাহাড়টার পেছন থেকে একটা রাইফেলের মুখ তাদের দিকে তাক করে আছে। দুঙ্ঘান নিজের কারবাইন

শরফ ও কজিৎজ্কি ফিরে চললো ঘোড়ার পিঠে। যে ঘোড়ার পিঠে আখমেদের লাশ রয়েছে, সেটাকে টেনে নিয়ে চললো পেছনে।

প্যান্থারের মতো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তীরবেগে জুরা নামছে ঢাল বেয়ে। পাহাড় ও টিলার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, গুড়ি মেরে, কুঁজো হয়ে ছুটতে ছুটতে একসময় সে বাসমাচিদের সঙ্গে সমান রেখায় এসে গেল। এবার পাহাড়ের ফাটল দিয়ে সে উঁকি মারে।

বাসমাচিদের একজন দুঙ্ঘান জাতের, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, মুখে বসন্তের দাগ। একখানা চিঠি দোলাতে দোলাতে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললে।

অন্যজন জাতে উজবেক, মোটাসোটা, প্রৌঢ়বয়স্ক,

রাইফেলটা চেপে ধরতেই একটা বুলেট ছুটে এল, রাইফেলটা ছিটকে পড়লো তার হাত থেকে।

রাইফেল তাক করে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর কণ্ঠে জুরা হুকুম করে,—হাত তোল!

বাসমাচিরা হাত তুললো। তারপরেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো জুরার হুকুমে। টীক ওদের পিঠে গিয়ে উঠলো, রাগে সে গরগর করছে।

দুজনের কোমরবন্ধ থেকে ছোরাগুলো বের করে নিয়ে জুরা তাদের পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেলে। তারপর তার হুকুম মতো ওরা ঢাল বেয়ে আগে আগে রওনা হয় পশ্চিম দিকে। ঘোড়াগুলো নিয়ে সে নিজে থাকে ওদের ঠিক পেছনে রাইফেল উঁচিয়ে।

ফেরার পথে গোরার সংগে দেখা হলো। হাঁফাতে হাঁফাতে রুদ্ধশ্বাসে সে ছুটে আসছে।

জুরা বললে,—বদমাশ এই বাসমাচি দুটোকে কয়েদ করেছি। আখমেদকে এরা খুন করেছে। আখমেদের সংগে কজিৎজ্কি ও শরফ ছিল। আমায় তারা দেখে নি। আখমেদের লাশ নিয়ে চলে গেছে।

আখমেদ খুন হয়েছে! গোরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। খবরটা এত আকস্মিক যে, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। এত বড় উদার মন, এমন বিশ্বস্ত বন্ধু আর এরকম ধীরস্থির বিপ্লবী অভিজ্ঞ যোদ্ধা হামেশা চোখে পড়ে না! সেই আখমেদ হঠাৎ চলে গেল! মাথা নীচু করে গোরা চোখের জল রোধ করে।

জুরার মনও বেদনায় ভরে উঠেছে। আখমেদের অভাব সহজে পূরণ হবার নয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে,—দেরি করা ঠিক হবে না, গোরা। বাসমাচির কারবাইনটা তুমি নাও। ওটা তোমার হলো। তোমার এই বন্দুকটা খুবই পুরনো ধরনের।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল গোরা। ঘোড়ার পিঠে হাতিয়ার রাখার জায়গায় নিজের বন্দুকটা রেখে টেনে নিলে জার্মান কারবাইনটা। আনমনে সেটা সাফ করতে করতে বললে,—কি ইচ্ছে করছে, জান? ইচ্ছে করছে, শয়তান দুটোকে কুচিকুচি করে কাটি।

সে ইচ্ছে আমারও হয়েছিল,—জুরা বললেঃ কিন্তু তুমি তো জান, সব ব্যাপারেই আইন মাফিক চলতে হবে। বদমাশ দুটোকে দিয়ে পর্বত থেকে ছাগলগুলো বয়ে এনে উটের পিঠে বোঝাই করাব।

কিছুক্ষণ পরে ছোট্ট কাফেলাটি রওনা হলো কেল্লার উদ্দেশে। আখমেদের মৃত্যুতে জুরা ও গোরা দুজনের মনই ভারাক্রান্ত। কারো মুখে কথা নেই।

পর্বতের ঢাল বেয়ে তারা নামছে। হঠাৎ বহু দূরে মারকান-সু'তে নিঃসংগ একজন ঘোড়সওয়ারের ওপর জুরা ও গোরার চোখ পড়ে। সাদা ঘোড়ার সওয়ার—কজিৎজ্কি ছাড়া আর কেউ নয়! তারা ভেবে পায় না, কজিৎজ্কি কেন একা একা ফিরছে।

সন্ধ্যা নাগাত কাফেলাটা কেল্লায় পৌঁছলো। আর সেই মুহূর্তে আখমেদের লাশ নিয়ে শরফও এসে গেল অন্য দিক থেকে।

কালো দাড়িওলা দীর্ঘকায় মুসা ফটক থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। খনখনে তীক্ষ্ন মেয়েলী গলায় মোটা উজবেকটি এবার কথা বলে,—আমাদের বাঁধন খুলে দাও। আমরা চাষী। তুষার-ঝড়ে আমাদের ভেড়াগুলো হারিয়ে গেছে, তাদের খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

মুসা কয়েদীদের হাতের দড়ি কেটে দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় পার্টিজানদের দিকে। জুরা তখনো বাসমাচিদের দিকে রাইফেল তাক করে আছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গোরা বললে,—এরাই আখমেদকে খুন করেছে!

মুসা চমকে উঠলো। খাপ থেকে রিভলবার টেনে নিয়ে বাসমাচিদের হুকুম দিলে ভেতরে ঢুকতে।

মোটা উজবেকটা চাষীর অভিনয় করতে করতে গোঙাচ্ছে বটে, কিন্তু দীর্ঘকায় দুংঘানটির বিদ্বেষ গোপনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। তার ভ্রূকুটিকুটিল চোখে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

দাঁড়াও, মুসা!—বলতে বলতে জুরা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে নিজের রাইফেলটা এগিয়ে দিলে গোরার দিকে। তার পরেই মোটা উজবেকটার ডান পায়ের বুট ধরে মারলে টান। বুটটা সহজেই খুলে এল, আর টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়লো ডাকাতটা।

বুটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জুরা টেনে বের করলে চিঠিখানা। সেটা শূন্যে নাড়তে নাড়তে সে বললে,—এই দেখ।

হঠাৎ চোখের পলকে ছুটে এল দুংঘান ডাকাতটা, চিঠিখানা ছোঁ মেরে জুরার হাত থেকে কেড়ে নিয়েই মুখে পুরে দিলে। দ্রুত সে চিবোতে শুরু করে চিঠিখানা।

সবাই হকচকিয়ে গেছে। পরক্ষণে জুরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাকাতটার ওপর। বাঁ হাতে তার মাথা আর ডান হাতে চোয়াল চেপে ধরে তার দাঁত ফাঁক করার জন্যে আঙুল দিয়ে সে তার গাল দুটো টিপে ধরলো। মুখ ফাঁক হয়ে গেল। মুসা টেনে বের করলে কোঁচকানো চিঠিটা।

ডাকাতটা প্রচণ্ড গুঁতোগুঁতি করে ছাড়া পাওয়ার জন্যে। কিন্তু জুরার বজ্রবাঁধন থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা বৃথা। সে বললে,—কুত্তার বাচ্চা, শেয়ালের বিষ্ঠা! আমার সবচেয়ে বড় দোস্তকে তোরা খুন করেছিস। এবার তোরা খুন হবি আমার হাতে!

মুসা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাসমাচিটাকে ছাড়িয়ে নিলে জুরার কবল থেকে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ দুংঘানের জিভ বেরিয়ে গেছে।

এরই মধ্যে হুকুম ভুলে গেলে?—মুসা বললে জুরাকে উদ্দেশ করেঃ সব কিছুই আইনমাফিক হবে। বাসমাচিদের ভেতরে ঢুকতে দাও। তুমি আর শরফ গিয়ে ঘটনাটা খুলে বলো কজুবেকে।

পার্টিজানরা নীরবে তাদের কমরেডের মৃতদেহের বাঁধন খুলে ফেলে। শোকাচ্ছন্ন সবাই। একখানা কম্বলের ওপর দেহটি রেখে নীরবে তারা বয়ে নিয়ে চলে ফটকের ভেতর দিয়ে। মৃতদেহের আগে আখমেদের ঘোড়া, পেছনে তার অস্ত্রশস্ত্র।

প্রত্যেক পার্টিজানের মনে একই প্রশ্ন, তারা ভেবে পায় না, কি করে দুজন মাত্র ডাকাত আখমেদের মতো একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে খুন করতে পারে। অতীতে চোরাচালানদারদের একটা দলকে সে একাই আটকে রেখেছিল। এমনি আরো নানা ঘটনা তাদের মনে পড়ে। আর এবার আখমেদ একা ছিল না, কজিৎজ্কির নেতৃত্বে তিনজনের বাহিনীর সে ছিল অন্যতম। তাই সমস্ত ব্যাপারটা তাদের কাছে খুবই রহস্যজনক মনে হয়।

মুসা বুরুজের মাথায় পাহারা দেবার জায়গায় গিয়ে ওঠে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায় চারদিকে। পূব দিকের পর্বতের ঢালে ভেড়ার পাল সচকিত হয়ে উঠেছে। সাদা ঘোড়ার পিঠে আসছে একজন সওয়ার। কজিৎজ্কিকে চিনতে মুসার ভুল হয় না।

কজুবের কামরায় ঢুকতে যাচ্ছে কজিৎজ্কি, হঠাৎ শরফ ফিসফিস করে কি বলতেই থমকে দাঁড়ালো। শরফ বললে,—ইমাম বল্বক আপনার কাছে যে দূতদের পাঠিয়েছিলেন, জুরা তাদের কয়েদ করেছে।

কজিৎজ্কি না ফিরেই তেমনিভাবে ফিসফিস করে বললে,—যাও, হুকুম তামিলের জন্যে তৈরী থাক।

তারপর চর্বিসিক্ত ভারী দরজায় সন্তর্পণে আঙুলের ঠেলা দিয়ে ভেতরে পা বাড়ায় সে।

বড় একখানা খাটে বিছানার ওপর প্যান্থার ও পার্বত্য ছাগলের চামড়া বিছানো। তার ওপর আসনপিঁড়ি করে শান্ত নির্বিকার মুখে বসে আছেন কজুবে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মোটা উজবেকটি ঘুষি আস্ফালন করে প্রাণপণে চিৎকার করে চলেছে, বোঝাতে চাইছে, তারা চাষী, তাদের ছেড়ে না দিলে কজুবেকে বিষম ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

কজিৎজ্কি এগোনোর জন্যে পা বাড়াতেই, কজুবে ভ্রূ নেড়ে তাকে ইসারায় বুঝিয়ে দিলেন, যেখানে আছ, সেখানেই থাক, আর এগোনো চলবে না।

আধ ঘণ্টা কেটে যায়। কজুবে তেমনি বসে আছেন—আত্মসমাহিত ও বাহ্যতঃ নির্বিকার।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উজবেক বাসমাচিটা শেষ পর্যন্ত বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বুঝতে পারে, চেঁচিয়ে ফল হবে না।

কজুবে মাথা নেড়ে ইসারা করতে জুরা চিঠিখানা কজুবের হাতে দিলে।

ওদের হাজতে নিয়ে যাও।—জুরাকে বললেন তিনি।

সবাই বেরিয়ে যায়। ঘরের মধ্যে দুজন, কজুবে ও কজিৎজ্কি। চিঠিখানা আরবীতে লেখা। কজুবে আরবী জানেন না। ওটা কজিৎজ্কির হাতে দিয়ে তিনি বললেন,—ডাকাতটার বুটের মধ্যে পাওয়া গেছে, গিলে ফেলারও চেষ্টা করেছিল।

চিঠিখানা খুললো কজিৎজ্কি। তীক্ষ্ণ চোখে কজুবে তাকিয়ে আছেন। কজিৎজ্কি কিন্তু বাইরে শান্ত।

বাজে!—নিস্পৃহভাবে চিঠিখানা দলামলা করে আগুনের দিকে ছুড়ে ফেলে হাই তুলতে তুলতে কজিৎজ্কি বললে ঃ সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে বাপ লিখেছে ছেলের কাছে।

দরজা খুলে মুসা ঢুকলো। সম্পূর্ণ খোলা রইল দরজা। জিজ্ঞাসু চোখে কজুবে তাকাতে, মুসা বললে,—আপনার সঙ্গেই শুধু কথা বলতে চাই।

এখানেই বলতে পার।—কজুবে বললেন।

সন্দেহ ও অবিশ্বাসভরা চোখে কজিৎজ্কির দিকে তাকিয়ে মুসা বললে,—পার্টিজানরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ উত্তেজিত। তারা বলছে, আখমেদের সঙ্গে কজিৎজ্কির ঝগড়া ছিল, বনিবনা হতো না। তাই ইচ্ছে করেই কজিৎজ্কি আখমেদকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। জুরা বলছে, সে যা দেখেছে তাতে মনে হয়েছে, দুশমন যে সামনে লুকিয়ে আছে আখমেদ তা বুঝতে পেরেছিল, তাই সে চেয়েছিল তাদের বেড় দিয়ে ঘুরে যেতে। কিন্তু কজিৎজ্কি তাকে বাধ্য করেছিল সোজা যেতে। আর তার ফলে দুশমনেরা তাকে সামনাসামনি গুলি করতে পেরেছিল।

কজুবে তাকান কজিৎজ্কির দিকে,—মুসা কি সত্যি বলছে?

হ্যাঁ!—কজিৎজ্কির নির্বিকার কণ্ঠঃ সোজা যেতে না চাওয়ায় আখমেদকে আমি কাপুরুষ বলেছিলাম।

দরজার বাইরে পার্টিজানদের ক্রুদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

এটা করার মানে?—কজুবে জিজ্ঞেস করেন।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পার্টিজানদের দিকে একবার

চোখ বুলিয়ে নিয়ে কজিৎজ্‌কি বললে,—আমি নিজেও গেছলাম আখমেদের সঙ্গে।

শরফের ডাক পড়ে। শরফ সমর্থন করে কজিৎজ্‌কির কথা।

কজিৎজ্‌কি উঠে দাঁড়ায়, শিরদাঁড়া টান করে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। পার্টিজানরা সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দেয়।

যে যার কাজে যাও।—কজুবে বললেন।

সবাই চলে যায়। ঘরে শুধু জুরা ও কজুবে। জুরা চিন্তামগ্ন। আগুনের দিকে মাথা হেলিয়ে ব্যথাতুর কণ্ঠে সে বললে,—জানেন কমরেড, আখমেদের মতন অমন দোস্ত আর হয় না। অনেক ভেবেছি, এখনও ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি নে, ডাকাতরা কজিৎজ্‌কিকে গুলি না করে আখমেদকে কেন গুলি করলে। আখমেদের কাছেই শুনেছি, বাসমাচিরা নেতা বা ঐ ধরনের মাতব্বর ব্যক্তিদেরই আগে গুলি করে। আর একটা ব্যাপারও ঠিক বুঝতে পারছি নে, কজিৎজ্‌কি আবার ওখানে ফিরে গেল কেন?

কজুবে নির্বাক। ঠোঁটে ঠোঁট চাপা।

হঠাৎ আগুনের ধারে দোমড়ানো চিঠিখানার ওপর চোখ পড়তেই জুরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। নিভে যাওয়া দুখানা কাঠের ওপর চিঠিখানা রয়েছে, নড়ছে আগুনের তাপে। জুরা অবাক চোখে দেখলো, কতকগুলো কালো হরফ ফুটে উঠেছে কাগজখানার গায়ে।

কি দেখছো?—কজুবে জিজ্ঞেস করেন।

—দেখুন।

কজুবে দেখলেন ব্যাপারটা, কিন্তু ভান করলেন, যেন গুরুতর তেমন কিছু নয়। বললেন,—জানি, ওটা একখানা চিঠি। যাই হোক ও নিয়ে মাথা ঘামিও না, কাউকে কিছু বলোও না। এখন যাও।

দরজা বন্ধ করে জুরা চলে যেতেই কজুবে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিলেন। চিঠিখানার হরফ আরবীও না, রাশিয়ানও না।

পরক্ষণে দরজায় শব্দ হতেই, চিঠিখানা কজুবে অতিদ্রুত কোমরবন্ধে লুকিয়ে ফেললেন। ঘরে ঢুকলো কজিৎজ্‌কি। সতৃষ্ণ দৃষ্টি তার আগুনের চুল্লির দিকে—কি যেন খুঁজছে সেখানে।

কি খুঁজছো?—কজুবে জিজ্ঞেস করেন।

—খুঁজছি সেই চিঠিখানা। ওখানেই ফেলেছিলাম। তামাক খেতে হবে, অথচ সিগারেট পাকানোর কাগজ নেই, তাই ওখানা খুঁজছি।

—বোধহয় পুড়ে গেছে। বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে কজিৎজ্‌কি বললে,—কী যে বিরক্তিকর ব্যাপার, কহতব্য নয়!

মুসা ঘরে ঢুকলো। বললে,—ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। তাদের আমি বলেছি, সমস্ত ঘটনা খুলে না বললে তাদের গুলি করে মারা হবে। এর ফলে মোটা উজবেক বাসমাচিটা ভয় পেয়ে গেছে। ধোঁয়া বেরোবার ফোকরে কান পেতে শুনলাম, সে বসন্তদাগওলা দুঙ্ঘান বাসমাচিটাকে সব স্বীকার করার জন্য পেড়াপীড়ি করছে, কিন্তু দুঙ্ঘান শাসাচ্ছে তাকে।

ব্যস্তসমস্তভাবে কজিৎজ্‌কি উঠে দাঁড়ালো।

ওদের আমি এক্ষুণি জেরা করবো।—বলতে বলতে কজুবের সম্মতি অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল সে।

কজিৎজ্‌কির গমন পথের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে চিন্তিত কণ্ঠে মুসা বললে,—একটা ভাল খবর পেলাম। পর্বতের ওপারের গাঁয়ে আখমেদের এক দোস্ত থাকে। তার কাছ থেকে জানতে পেলাম, ওশ যাবার পথে আইভান তাদের গাঁয়ে আস্তানা নিয়েছে।

—কোন্ আইভান?

—দারাউত-কুরঘানে গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতিকে যে কাজকর্মে সাহায্য করতো।

—ওহো বুঝেছি হিসাবনবিস আইভান। খুব ভাল হলো। ঘোড়া ঠিক করো। এখুনি রওনা হবো।

পূর্ণিমার রাত। গিরিখাতের ভেতর দিয়ে জোর কদমে ছুটে চলেছে কজুবে ও মুসার ঘোড়া দুটো। পথ চলতে অসুবিধা নেই। কিন্তু পর্বত পার হয়ে গ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত দুপুর গড়িয়ে গেল।

আইভানকে ঘুম থেকে তুলে কজুবে তার হাতে চিঠিখানা দিয়ে বললেন,—পড়ে বলুন তো, কি আছে। আপনার সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যে দরকার হলে আমি সীমান্ত ফৌজের ঘাঁটি পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সে বহু দূরের পথ। জোর বরাত, আপনাকে হাতের কাছেই পেয়ে গেলাম।

নাকে চশমা এঁটে আইভান চিঠিখানা খুলে ধরে। ক্ষণপরে বলে,—চিঠিখানা বিদেশী ভাষায় লেখা। দুধ দিয়ে লেখা, গরম করলেই সব বেরিয়ে পড়ে। এটা একটা সাধারণ পরিচিত কৌশল। চিঠিতে লেখা আছেঃ মিঃ কজিৎজ্‌কি 5, XI। সর্দার শো-কে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে N. B. 123।

নিস্তব্ধ কামরা। কজুবের দুই ঠোঁট দৃঢ়সম্বন্ধ। চোখ দুটো কিঞ্চিৎ কুঁচকে গেছে। নীরবে চিঠিখানা নিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে একটা চামড়ার মানিব্যাগে ঢুকিয়ে ব্যাগটা তিনি বুকপকেটে রেখে দিলেন। তারপর আই-ভানের সঙ্গে সাদর করমর্দন করে মুসাকে নিয়ে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন কেল্লার দিকে।

পথে যেতে যেতে নিজের মনেই বলেন তিনি,—নোংরা পাতি শেয়াল! আজই সবকিছুর বোঝাপড়া হবে। কয়েদীদের তক্ষুণি জেরা না করে বড্ড ভুল করেছি। ফিরেই ওটা করে ফেলতে হবে। সমস্ত টেনে বের করবো।

কেল্লায় পেঁছে কজুবে শুনলেন, ডাকাতদের গুলি করে মারার জন্যে কজিৎজ্‌কি পরোয়ানা লিখছে।

বটে! দ্রুত পায়ে তিনি চললেন কজিৎজ্‌কির কামরায়। মুসা পেছনে। কজিৎজ্‌কি কামরায় নেই। হঠাৎ গোলমাল কানে এল ডাক্তারের কামরা থেকে। ওখানেই জুরা থাকে।

॥ পাঁচ ॥

কজুবে বেরিয়ে যেতেই গোরা জুরাকে গিয়ে জানায়, সে তাকে যে জার্মান কারবাইনটা দিয়েছিল, কজিৎজ্‌কি তা কেড়ে নিয়েছে।

জুরা গেল কজিৎজ্‌কির কাছে—ব্যাপার কি, জানতে। কিন্তু প্রতিদানে পেল শুধু অত্যন্ত অপমানকর ব্যবহার।

কজিৎজ্‌কির এটা পূর্ব-পরিকল্পিত। ইচ্ছে করেই সে এই দুর্ব্যবহার করে জুরার সঙ্গে—জুরাকে চটানোই তার মতলব।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জুরা বেরিয়ে এল এবং ভাঁড়ার-ঘর থেকে শিকার-করা একটা আস্ত ভেড়া কাঁধে ফেলে সোজা রওনা হয়ে গেল পাশের গাঁয়ের বৃদ্ধ সর্দারের বাড়ি। এই বাড়িতেই সে কিছুদিন আগে খানা-তল্লাসি করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে বৃদ্ধ সর্দার আর তরুণ শিকারীর মধ্যে অদ্ভুত এক অন্তরঙ্গ দোস্তি গড়ে উঠেছে।

সর্দারের তাঁবু। চুল্লির পাশে বসে জুরা আগুনে হাত সেঁকছে। পাত্রে রান্না হচ্ছে ভেড়াটা। মাঝে মাঝে জুরা কথা বলছে—ছাড়াছাড়া অসংলগ্ন কথা। বৃদ্ধ নীরবে শুনছে।

শেষে জুরা বললে,—গোরাকে একটা কারবাইন দিয়েছিলাম, কিন্তু কজিৎজ্‌কি সেটা কেড়ে নিয়েছে। বেশ, তাই হোক। আমিও আর শিকারে যাচ্ছি না। আমার এই সিদ্ধান্ত ঠিক কি না?

সর্দার চোখ বুজে আগুনের ধারে নীরবে বসে থাকেন। তাঁর ভাঁজ-পড়া কোঁচকানো মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জুরা আবার জিজ্ঞেস করে,—কি বলেন সর্দার, আমি যা বললাম ঠিক কিনা?

না।—চোখ না খুলেই শান্তকণ্ঠে বৃদ্ধ বলেনঃ ভুল করছো। ওটা ঠিক নয়।

লম্বা রোগাটে গড়ন সর্দারের। বয়সের ভারে কুঁজোও কিছুটা। হঠাৎ তাঁর পাতলা দাড়ি আর গোঁফের বিরল-প্রায় চুল কয়টা কাঁপতে শুরু করে। চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করে ঝাঁঝালো গলায় বৃদ্ধ বললেন,—বুঝলে, আজ আমার বয়েস হয়েছে, বুড়ো হয়েছি—এই দীর্ঘ জীবনে কি না দেখেছি! তোমার ঠাকুদ্দার বাবা ডম্‌-বুলকে দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো এরকম বাঘা দুঃসাহসী জোয়ান আমি কখনো দেখিনি। তোমার কথা আমি আগেও শুনেছি। আকাশছোঁয়া গিরিচূড়ার দুরন্ত ঈগল তুমি। জান দোস্ত, আমার পঁচিশটি ছেলে ছিল? সবাই লড়াইয়ে খতম হয়েছে। এখন আপন বলতে আছে শুধু এক নাতনী।

ক্ষণেক চুপ করেন সর্দার। দম নিয়ে আবার শুরু করেন,—তোমায় আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, জুরা। তোমার মঙ্গল কামনা করি সদাসর্বদা। তাই বলছি, তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। কেন নয়, পরে আরো জানতে পারবে। তোমায় এবার একটা গুরুতর কথা বলবো। আগামী পরশু বাসমাচি-দলের অন্যতম প্রধান নেতা শো'র প্রধান সহকারী সর্দার আজিম তার দলবল নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে মারকান-সু আসছে। পীরের দরগা চেন তো—যেটা ফি বছর কয়েক ইঞ্চি করে উঁচু হয়? সেই দরগা পার হয়ে তারা যাবে। এই বুড়ো লোকটাকে একটু মেহেরবানি করবে, জুরা—আজিমকে মেরে তার মাথাটা আমায় এনে দেবে? আমার সবচেয়ে ছোট আদরের ছেলেটিকে সে খুন করেছে। এ কাজের জন্যে তোমায় আমি একটা রিপীটিং রাইফেল দেব।

জুরা ততক্ষণে অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে, তার দুই চোখ ঝকঝক করছে তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো। উত্তেজিত কণ্ঠে সে বললে,—তাই হবে, সর্দার! কবুল করছি, আজিমের মাথা আপনাকে এনে দেব।

সর্দার উঠে গিয়ে তাঁবুর এক কোণে পশমী কাপড়-চোপড়ের গাদা থেকে একটা ইংলিশ রিপীটিং রাইফেল ও ছোট এক ব্যাগ কার্তুজ নিয়ে এলো।

সর্দারের হাত থেকে ওগুলো নিতে নিতে কঠিন নীচু গলায় জুরা বললে,—বৃদ্ধ, আজিমের গর্দান আপনি পাবেন।

খাওয়াদাওয়া সেরে জুরা যখন কেল্লায় ফিরলো, রাত তখন অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলেছে, সর্দারের-দেওয়া এ খবর সে কাউকে ঘূণাক্ষরেও জানাবে না, একাই ডাকাতদলকে খতম করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে, দেখাবে তার হিম্মৎ কতখানি।

হাঁটু গেড়ে জুরা ডাক্তারের কামরায় বসে আছে। হঠাৎ টীকের চিৎকার তার কানে এল, তারপরেই উপর্যুপরি গুলির আওয়াজ। কিন্তু জুরা নিশ্চল।

আধ ঘণ্টা কেটে যায়। হঠাৎ বাতির শিখাটি কেঁপে উঠলো। এক দমকা ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকতেই জুরা ঘাড় ফেরায়। দেখে, দরজার চৌকাঠে পা রেখে কজিৎজ্কি দাঁড়িয়ে আছে।

তোমায় আমার সহকারী করতে চাই, পছন্দ করো? কজিৎজ্কি বলেঃ তুমি আর আমি দুজনে বাসমাচিদের সঙ্গে লড়াই করতে যাব, কি বলো?

জুরা নির্বাক।

চোখ কুঁচকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কজিৎজ্কি আবার বললে,—ভয় পেয়েছ, মনে হচ্ছে। কাপুরুষ!

জুরা চমকে ওঠে। সোজা তাকায় কজিৎজ্কির দিকে। রাগে ফুঁসে উঠলো সে,—তুমিই কাপুরুষ!

কী! এত বেয়াদপি তোমার!—কজিৎজ্কি গর্জে ওঠে, এগিয়ে যায় জুরার দিকে। জুরার পেছনে ইংলিশ রাইফেলটা রয়েছে, তার ওপর নজর পড়তেই সে ওটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে,—কোথায় পেলে এটা?

জুরা জবাব দেয় না।

রাইফেলটা বাতির সামনে নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে কজিৎজ্কি সবিস্ময়ে বললে,—অ্যাঁ! একেবারে আনকোরা নতুন ইংলিশ রাইফেল! ভারী তাজ্জব ব্যাপার তো? কোত্থেকে হাতিয়েছ এটা?

বলবো না।—ঠাণ্ডা ইস্পাত-কঠিন কণ্ঠ জুরার। চোখে ভ্রূকুটি।

কজিৎজ্কি চেঁচিয়ে উঠলো,—বটে! আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার সাহস তোমার! বড্ড বেড়ে গেছ, দেখছি! রাইফেলটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।

দরজার দিকে সে পা বাড়ায়।

হেই!—দুঃসহ রাগে জুরা হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলোঃ আমার রাইফেল নিয়ে যাচ্ছ কোথায়? কজুবে বলেছেন, যে যা রাইফেল পাবে, সেটা তার। রেখে যাও, বলছি।

কজিৎজ্কি জবাব না দিয়ে এগিয়ে যায়।

বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে জুরা রাইফেলটা কেড়ে নিলে তার হাত থেকে।

তীক্ষ্ম চিৎকার ছেড়ে কজিৎজ্কি রিভলবার টেনে বের করলো। চোখের পলকে জুরাও সোজা রাইফেল তাক করলো কজিৎজ্কির বুক লক্ষ্য করে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সশব্দে দরজা খুলে গেল, কজুবে এসে দাঁড়ালেন চৌকাঠের ওপর।

রিভলবার, রাইফেল সরিয়ে নাও!—ভয়ঙ্কর কণ্ঠ কজুবের।

জুরা ও কজিৎজ্কি সঙ্গে সঙ্গে হাতিয়ার সরিয়ে নিলে। খাপে রিভলবার ঢোকাতে ঢোকাতে রুশ ভাষায় কজিৎজ্কি গর্জায়,—অসহ্য! এ অসহ্য! চাষীদের ঘরে বেআইনী হামলা ও খানাতল্লাস আর বেআদপির জন্যে অনেক আগেই ওকে গুলি করে মারা উচিত ছিল!

কজুবের চোখে ভ্রূকুটি দেখা দেয়। তবু যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে তিনি বললেন কজিৎজ্কিকে,—তোমার সঙ্গে কথা আছে। এস আমার সঙ্গে।

বলতে বলতে তিনি বাইরে পা বাড়ালেন। পেছনে কজিৎজ্কি ও মুসা।

নিজের কামরায় ঢুকে কজুবে ফিরে দাঁড়ান কজিৎজ্কির দিকে,—রিভলবারটা মুসার হাতে দাও।

ভীষণ চমকে ওঠে কজিৎজ্কি। নিদারুণ ঘাবড়ে গিয়ে বলে,—মানে! কী আজেবাজে বকছেন! একটা গেঁয়ো বেতমীজের জন্যে সারা ফৌজের কাছে আমায় বেইজ্জত করছেন!

রিভলবারের ওপর হাত রেখে কজুবে বললেন,—হুকুম দেওয়া হয়েছে, তামিল করতে হবে!

মুসা এগিয়ে এসে কজিৎজ্কির রিভলবারটা বের করে নিলে। তারপর কজুবের ইশারায় আবার গিয়ে দাঁড়াল ঘরের বাইরে দরজার সামনে।

ঘরের মাঝখানে কজুবে আর কজিৎজ্কি। দুজনে নিঃশব্দে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাসমাচি দুজনকে গুলি করে মারলে কেন?—শেষে কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন কজুবে।

কজিৎজ্কি জবাব দেয় না। চোখ কুঁচকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কজুবে বুক পকেট থেকে

একটা চামড়ার ব্যাগ বের করে তার থেকে বের করলেন দোমড়ানো একটা চিঠি।

কুত্তা ডাকাত, কবুল কর্!—ফিসফিস করে ওঠেন কজুবে। তাঁর মুখ কালো হয়ে গেছে, গলার শিরা-গুলো ফুলে উঠেছে।

কজিৎজ্কি ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। সে শুরু করে কৈফিয়ৎ। তার ফন্দি-ফিকির ও কলাকৌশলের জন্যে এ পর্যন্ত কত বাসমাচি ডাকাত ও চোরাচালানদার ধরা পড়েছে যার জন্যে কজুবে নিজে তাকে প্রধান সহকারী হিসাবে বাছাই করেছেন, তার এক লম্বা ফিরিস্তি সে দিয়ে গেল। শেষে বললে,—তাহলে দেখুন, ফৌজে আপনার পরেই যার স্থান, ডজন ডজন ডাকাতকে যে পাকড়াও করেছে, গুলি করে মেরেছে, সেই আমি কেন একজোড়া বাসমাচিকে গুলি করতে পারবো না, বিশেষ করে সবচেয়ে সেরা পার্টিজানদের একজন আখমেদকে যারা খুন করেছে?

কিন্তু এটা কি? ছেলের কাছে বাপের চিঠি?—তীক্ষ্ন নীচু গলায় কজুবে বলেন।

পাল্টা জবাব এল কজিৎজ্কির কাছ থেকে,—কি হয়েছে তাতে? ওটা একটা ফাঁদ। সর্দার শো'র সঙ্গে আমার কথাবার্তা চলছিল, তাকে কথা দিয়ে-ছিলাম আজিমের দলকে পার হয়ে যেতে দেব। এইভাবে ওদের আমি ফাঁদে ফেলতে চেয়েছি। আগের মতো এটাও একটা ফন্দি, বুঝতে পারছেন না?

মাথা নাড়তে নাড়তে কজুবে বললেন,—তা বটে!

এই দেখুন, আপনার দুশমনই যদি হতাম...—বলতে বলতে কজিৎজ্কি পকেট থেকে ছোট একটা রিভলবার বের করে সোজা তাক করলো কজুবের দিকে।

দু হাত পেছনে নিতে নিতে ধীর কণ্ঠে কজুবে বললেন,—হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

রিভলবারটা তাঁর হাতে দিতে দিতে কজিৎজ্কি অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বললে,—এটা আপনার। আপনাকে সওগাত দিচ্ছি।

কজুবে জিজ্ঞেস করলেন,—ডাকাতরা কবে কোন্ পথে সীমান্ত পার হবে?

কজিৎজ্কি একটু চমকে উঠলো, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললো,—আগামী পরশু কারা-কুল হ্রদ এলাকায় উটের নাক বলে যে পর্বতটা আছে, তার ঢালের পাশে। আমার এই গোপন ফাঁদে তারা এসে পড়বে আর তার ফলে আপনার হাতে আসবে চল্লিশটে ইংলিশ রাইফেল, তিরিশটে জাপানী কারবাইন, মশার পিস্তল, কোল্ট পিস্তল ইত্যাদি। নিজেদের মধ্যে আমরা কেন ঝগড়া করবো, কমরেড কজুবে? আসুন, করমর্দন করা যাক!

বলতে বলতে কজিৎজ্কি হাত বাড়িয়ে দিতেই, কজুবে তার হাত চেপে ধরলেন। কজুবের হাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে কজিৎজ্কি বললে,—সেই ভাল যার শেষ ভাল!

কজুবে কিন্তু তার হাত ছাড়লেন না, চোখও সরালেন না তার ওপর থেকে। কজিৎজ্কি বললে,—আচ্ছা, এইবার তাহলে আসি।

কজুবে হাঁক দেন,—মুসা, কজিৎজ্কিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও!

তার মানে!—আবার ভীষণ চমকে ওঠে কজিৎজ্কিঃ আমি তো নিজেই যেতে পারি!

কজিৎজ্কির হাত তখনো কজুবের মুঠোর মধ্যে। নীরস হেসে তিনি বললেন,—তা বটে! কিন্তু তোমার পেছনে দরজা বন্ধ করবে কে?

—কোন্ দরজা?

—গারদের!

কি বলছেন আপনি!—পাতলা দুই ঠোঁট সজোরে চাপতে চাপতে কজিৎজ্কি জিজ্ঞেস করে। তার দম যেন আটকে আসছে।

বুঝতে পারছো না, ঘৃণ্য পাতিশেয়াল? বলছি, গারদে যেতে হবে!—কঠিন কণ্ঠ কজুবের। মুসাকে হুকুম করেনঃ ওর পেছনের পকেটে আর একটা রিভল-বার আছে, সেটা বের করে নাও।

কজিৎজ্কি ধস্তাধস্তি করতে থাকে। কিন্তু তার হাত তখনো কজুবের মুঠোর মধ্যে। মুসা তার চোরাই পকেট থেকে টেনে বের করলো ছোট একটা ব্রাউনিং রিভলবার আর খুদে এক ধাতব কৌটো।

কজিৎজ্কির হাত ছেড়ে দিয়ে কজুবে রিভলবার আর কৌটোটা নেন মুসার হাত থেকে। তীব্র বিষ কৌটোটায়।

কজিৎজ্কির কাছে এগিয়ে গিয়ে কজুবে বললেন,—শোন কাঁকড়া-বিছে, দুশো রাইফেলের জন্যেও আমি আখমেদকে হারাতে রাজী নই। ডাকাতদের সম্বন্ধে যা বললে, তা মিথ্যে হলে মনে থাকে যেন—

বলতে বলতে কজিৎজ্কির গলার ওপর আড়াআড়ি-ভাবে আঙুল বুলিয়ে বললেন,— বুঝতে পারছো?

কজিৎজ্কি দুলে উঠলো। মুসার দিকে ফিরে

কজ্‌বে বললেন,—তুমি, শরফ ও জুরা ছাড়া আর কেউ জানবে না যে, কুত্তাটা গারদে আছে। ওর সংগে বোধ-হয় খুবই নরম ব্যবহার করা হচ্ছে। ওকে নিয়ে যাও।

ভাঁড়ারের পাশেই গারদ। কজিৎজ্‌কিকে সেখানে আটক করে মুসা চাবিটা দিলে শরফের হাতে।

জুরাকে ডেকে দাও।—কজ্‌বে হুকুম করেন একজন আর্দালীকে।

কয়েক মিনিট পরে খবর এল, জুরা শিকারে বেরিয়ে গেছে—একলাই।

একলা শিকারে বেরিয়ে গেছে! তাজ্জব ব্যাপার! অত্যন্ত অবাক হন কজ্‌বে। আগুনের ধারে গিয়ে বসেন তিনি। নিজের মনে বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেনঃ ভারী তাজ্জব ব্যাপার তো!

গভীর চিন্তায় তিনি ডুবে যান।

॥ ছয় ॥

অন্ধকার কালো রাত্রি। পুঞ্জীভূত মেঘ নীচুতে নেমে এসেছে। সন্ধ্যা থেকে তুষার পড়ছিল, সকালের দিকে তা বন্ধ হলো। পর্বতশ্রেণী ঢেকে ফেলে মেঘ-পুঞ্জ গড়িয়ে নেমে এসেছে মারকান-সুর ওপর।

কিজিল-আর্ট গিরিবর্ত্মের কাছে পর্বত-ঢালের ওপরে টিলা ও পাথর-স্তূপের ফাঁকে জুরা ঘুমিয়ে আছে। তুষারে আচ্ছন্ন সে। টীক শুয়ে আছে পাশে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা। তার গায়ে তুলোর মোটা আবরণ।

স্তব্ধ নিদ্রামগ্ন মরুভূমি। দূর পূব থেকে মাঝে মাঝে শুধু ভেসে আসে নেকড়েদের চিৎকার।

ফরসা হচ্ছে, তবু কুয়াশা সরে না। হঠাৎ টীক কান খাড়া করেই লাফিয়ে উঠলো, জুরার কাছে ছুটে গিয়ে নাক দিয়ে নিঃশব্দে ঠেলতে শুরু করলো তাকে।

জুরা জেগে যায়। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে কম্বল পেতে তার ওপর শুয়ে পড়ে সে। পাশে রাখে কার্তুজের প্যাকেট। তারপর পাহাড়ের ফাটল দিয়ে রাইফেলটা এগিয়ে দেয় সামনের দিকে।

এক পাহাড়ের মাথায় ঘাঁটি করেছে সে। গাদা গাদা টিলা ও পাথরের চাংড়ায় মাথাটা সব দিকে ঘেরা। উত্তর দিক থেকে সে নিরাপদ। সেদিকে রয়েছে এক বিশাল পর্বতের দুর্লঙ্ঘ্য খাড়াই। আর পূবে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ধু-ধু করছে দিগন্তবিসারী ঘূর্ণিবাত্যার মরুভূমি—মারকান-সু।

দমকা হাওয়ায় কুয়াশা সরে যেতেই দেখা গেল, কয়েক ডজন সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার এলোমেলোভাবে দল বেঁধে পূব দিক থেকে এগিয়ে আসছে।

সংগে সংগে শিকারীর উত্তেজনা জুরাকে পেয়ে বসে। ঘোড়সওয়ারদের সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে। আজিমকে খুঁজছে সে। শেষে দলের মাঝখানে সাদাদাড়িওলা সর্দারকে সে দেখতে পায়।

সাবধানে সে রাইফেল তাক করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর এক সময় ঘোড়সওয়ার-দের মাঝে সর্দারের মাথাটা পেছন থেকে একবার দেখা

যেতেই তার রাইফেল গর্জে উঠলো। সর্দার আজিম গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

বেইমানি! বেইমানি!—দলের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল। কিছু লোক ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আবার চম্পট দিল পূবমুখো। অন্যোরা ধাওয়া করলো সামনের দিকে। ঘোড়া থেকে নেমে টিলা-পাথরের পেছনে গা ঢাকা দিয়ে জুরাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করলো।

বুলেট ছোটে হিস্‌হিস্‌ শব্দে, পাহাড়ে পাথরে ঘা খেয়ে ঠিকরে পড়ছে। সমানে গুলি চালাচ্ছে জুরা। তিনজন লোক চেষ্টা করছিল সর্দার আজিমের দেহটা ঘোড়ার পিঠে তোলার জন্যে। জুরার রাইফেল গর্জে উঠলো। খতম হলো তিনজনাই।

জুরা ওৎ পেতে থাকে অবশিষ্ট ডাকাতদের জন্যে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওদের সন্ধান করে ফেরে। সামনের পাহাড়-টিলা-পাথরের আড়ালে ওরা লুকিয়েছে। টিলা বা পাথরের ঢিবির পেছন থেকে কোন মাথা উঁকি মারলেই, জুরার অব্যর্থ রাইফেল গর্জে উঠছে।

বাসমাচিরা প্রথমে ভেবেছিল, ওৎ-পেতে-থাকা বড় একদল পার্টিজানের কবলে তারা পড়েছে। কিন্তু যখনই বুঝলো যে, রাইফেলধারী দুশমন মাত্র একজন এবং সে ঐ সামনের পাহাড়ে লুকিয়ে আছে, তখনই তাকে ঘিরে ফেলার মতলবে তারা টিলা থেকে টিলায় লাফিয়ে পড়ে ছুটতে শুরু করে। আর জুরার গুলিও ছোটে অব্যর্থ লক্ষ্যে। ফলে বাসমাচিরা আবার টিলা ও ঢিবির পেছনে গা ঢাকা দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, সওয়ারহীন একপাল ঘোড়া ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে মরুভূমির মধ্যে।

জুরা এবার টীককে লেলিয়ে দেয় বাসমাচিদের ওপর। গোলাগুলি চলার ফলে এমনিতেই টীক উত্তে-জিত, তার ওপর বেপরোয়া স্বভাব সে পেয়েছে মনিবের কাছ থেকে। সে ছুটলো ঢাল বেয়ে। টিলা ও ঢিবির পেছনে ডাকাতদের সে খুঁজে বের করে। যারা জ্যান্ত তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে। আতঙ্কিত ডাকাতের দল পাথরের পেছন থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসতেই পড়ে যায় জুরার রাইফেলের মুখে।

বাসমাচিদের অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। নিরুপায় তারা। শেষ পর্যন্ত প্রধান যে দলটি পাহাড়ের এক বড় গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, তার থেকে তিনজনকে তারা পাঠাল জুরাকে পেছন থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্যে।

উত্তর দিক সম্বন্ধে জুরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। উত্তরে দুরারোহ খাড়া পর্বত প্রায় সোজা উঠে গেছে। কিন্তু লোক তিনটি সেই খাড়াই বেয়েই উপরে উঠতে শুরু করলো।

তারা দ্রুত উঠছে। পর্বতের দিকে মুখ করে, যেখানে যেটুকু সঙ্কীর্ণ পা রাখার জায়গা পাচ্ছে, সেখানে আঙুলের ভর দিয়ে, পর্বতের ফাটল আঁকড়ে ধরে দম আটকে তারা উঠছে। আর বারবার পেছনে ঘাড় বেঁকিয়ে জুরার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে দারুণ আতঙ্কে। পর্বতের খাড়া গায়ে সম্পূর্ণ অরক্ষিত তারা। একবার শুধু জুরার নজরে পড়ে যাওয়া, পরক্ষণে বসে-থাকা তিতির পাখির মতো সে তাদের গুলি করে মারবে।

কিন্তু জুরা তখন সামনের ডাকাতদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে, পেছনের পর্বতটার দিকে একবার তাকাবারও দরকার মনে করছে না। একবারও লক্ষ্য করছে না, পেছন থেকে কিভাবে বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

একবার সে কার্তুজ নেবার জন্যে পেছনে ঘাড় ফেরাতেই, একটা ডাকাত দারুণ ভয়ে হাত ফসকে নীচে আছাড় খেয়ে পড়লে টিলা-ঢিবির ওপর। তখনো লড়াই চলেছে। সেই উত্তেজনায় জুরা এটা লক্ষ্যই করলো না।

শেষ পর্যন্ত গোলাগুলি বন্ধ হলো একসময়। লড়াই ফতে হয়েছে। টিলা-ঢিবির পেছনে আর কোন বাসমাচি নেই। দূরে গুহার সামনে থেকে টীকের ক্রুদ্ধ চিৎকার কানে আসছে। ওখানে গুহার ভেতরে কিছু ডাকাতের সন্ধান সে পেয়েছে।

ঘর্মাক্ত দেহে বিজয়ী জুরা টিলা-ঢিবির আড়াল থেকে উঠে দাঁড়ালো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে ছুটে এল একটা বুলেট, পাথরে ঘা খেয়ে সবেগে ঠিকরে গিয়ে লাগলো তার মাথায়।

জুরার হাত থেকে রাইফেল খসে পড়লো। কাত হয়ে পড়ে গেল সে। একবার শুধু তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—এবার খতম...আর রেহাই নেই...

[ক্রমশঃ]

কবিতাগুচ্ছ

শেষ কদিনের রুজি

অশোক হালদার

যাচ্ছে যে ওই বেলুন-ওলা বেলুন ফিরি করেঃ
এই পথে ওর আসা-যাওয়া তিরিশ বছর ধরে।
বেচতো তখন বেলুন-বাঁশি সাপ-খেলানো সুরে—
স্ফূর্তি দিতো রবিবারের আলসে সকাল জুড়ে।
ঝাঁকড়া চুলের কালো মাথা দুলতো তালে তালেঃ
ছেলেমেয়ে ছুটতো যেন বাঘ পড়েছে পালে।
বেলুন-বাঁশি বাজিয়ে ওরা আসতো ঘরে ফিরে,
বাঁশি-ওলা হারিয়ে যেতো নানান লোকের ভিড়ে।
রবিবারে এমনি খুশির সকাল এনে দিয়ে—
কোথা দিয়ে তিরিশ বছর গেলো যে ও নিয়ে!
এখন বুড়ো থুত্থুরে ও রোজ বিকেলে আসে,
ফুলো ফুলো বেলুনগুলো লাঠির আগায় ভাসে।
বললো সেদিন, "নাও না বাবু, বেলুন একটা দুটো;
বেলুন বেচেই আমার জোটে দুবেলা দুমুঠো।"
বলি, "আসতে আগে রবিবার, এখন আসো রোজ—
পয়সা অতো কোথায় মেলে রাখো কি তার খোঁজ?"
ম্লান হেসে ও ফোকলা গালে বললো, "বাবু, তবে
বেলুন বেচে শেষ বয়সে উপোস করতে হবে?
শুধু কি এই বেলুন দিলুম ছোট্ট হাতে আমি?
কচি মুখে দিলুম হাসি লক্ষ টাকা দামী।
হাসিটুকু ফাউ নিতে চাও, দাম দেবে না বুঝি?
এই তো আমার পেনশন্—শেষ কটা দিনের রুজি।"

সবজান্তা

গোবিন্দ গোস্বামী

হনলুলু কোথায় বলো
কোথায় মাদাগাসকার
হ্যানিবলের খ্যাতি কেন
ছিলেন কোথায় রাজা জার?
টাওয়ার কোথায় ঝুঁকে আছে
দীর্ঘ কোথায় নদীর সেতু
গ্রহ কিংবা উপগ্রহের
কোন্‌টি হবে রাহুকেতু?
কোহিনুরটি চোখ ধাঁধিয়ে
আজো বলো কোথায় শোভে
নায়াগ্রা সে কোন্ দেশেতে
দেখছে সবাই কিসের লোভে?

সবজান্তার প্রশ্নে পাগল
বলল টুটুল, আচ্ছা তবে—
বলো দেখি এই বাংলার
রাজধানীটি কোথায় হবে?

সবজান্তা চোঁচা দৌড়,
পালিয়ে গেল সেখান থেকে,
হাতটি তুলে বলল শুধু—
আসছি দাঁড়াও বইটা দেখে!

চোর

স্মৃতিবিকাশ ঘোষ

পাশের বাড়ী চোর পড়েছে হুলস্থুলে কাণ্ড
শব্দ শুনেই উঠল রাতে পাড়ার যত স্যাণ্ডো।
হাত-পা ছুঁড়ে ডাণ্ডা হাতে কি যে তাদের ঝম্প,
ব্যাপার-স্যাপার দেখে সবার লাগল বুকে কম্প!
বললে ছেনো—'রামুর ছাদে চোরটা আছে ঘাপটে
ধরতে হবে বাগিয়ে ওরে পিছন থেকে জাপটে।
শব্দ নাকি আসছে ভেসে ওই বরাবর কোণটা
ওইখানেতেই আছে ব্যাটা—বলছে যেন মনটা।'
কে উঠবে ছাদের পরে লাগল মহা দ্বন্দ্ব
বুক ঢিপ ঢিপ করছে—যদি হয় চোরটা মন্দ!
এগিয়ে এল তখন হাঁদু—সে এক উঠতি রকবাজ
আস্তিনটা গুটিয়ে বলেঃ এ আর কি বা কঠিন কাজ!
তরতরিয়ে উঠল ছাদে একা একাই শেষটা,
তস্কর নেই ত্রিসীমানায়—ঘুমোয় শুধু কেষ্টা!
ভুরুৎ ভুরুৎ ডাকাচ্ছে নাক, বিকট তার-ই জোরটা,
রাত-দুপুরে মালুম হলো—হায় রে কোথায় চোরটা!!

ফুল

বিমল সেন

একটা বাগানে ছিলো রক্তগোলাপ,
রিণির ইচ্ছে সেটা তুলবে;
ঘন কালো চুলে যদি গোঁজে সে গোলাপ
ভাবে, তার রূপ আরও খুলবে!
তাই তো!
বাড়ীর একটু দূরে সে বাগান ছিলো,
বিকেলেই রিণিঝিনি বই হাতে নিলো;
মাকে বলে, 'সীতাদির কাছে পড়ে আসি।'
মা বলেন, 'লেখাপড়া খুব ভালবাসি।'
লক্ষ্মী!
ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে
এদিকে আসছে যেন বই হাতে নিয়ে!
কাছে এলে বুঝলাম মেয়েটাকে চিনি,
এ পাড়ারই মেয়ে, ওর ডাক নাম রিণি।
দুষ্টু!
চুপি চুপি কাছে এসে মেয়েটা দাঁড়ায়,
আলগোছে গোলাপের গাছটা নাড়ায়,
সলজ্জে চেয়ে বলে, 'সুন্দর ফুল!'
বুঝি, তার মন দোলে দোদুল দোদুল!
লজ্জা!
বলি তাকে, 'নাও খুকু একটা গোলাপ।'
আনন্দে রিণি ফুল তুললো।
তারপর কালো চুলে গোঁজে সে গোলাপ,
ফুলটারই রূপ যেন খুললো!
তাই না!

কচি ও কোমল যারা

প্রবাসজীবন চৌধুরী

মলিন ভরসাহীন ছোটো ছোটো শিশুদের দেখো!
আধো-আধো ভাষা শোনো, কতো আশা কতো কি যে চায়
রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ, ধ্বনি যতো—রমণীয় রেখো
ওদের স্মরণ কোরে; ভালোবাসা ওরা যেন পায়!

আকাশের খসা তারা, ধরণীর ধুলো-মাখা মুখে—
জ্বলুক হাসির আলো; দুই চোখে জিজ্ঞাসা অধীর!
বই, ছবি খেলা দাও রকমারী, তুলে নাও বুকে—
আদর সম্মান দাও, শিক্ষা দাও—শক্ত করো শির॥

নাকের কথা

নচিকেতা ভরদ্বাজ

এক যে ছিল বুড়ো তাহার ভীষণ লম্বা নাক
আকাশ থেকে হরেক রকম
পাখীরা ঝাঁক ঝাঁক
সেই নাকেতে বসত এসে
করত বসে গান।

কিন্তু তারা চলে যেত সারা দিনের শেষে
উড়ে যে যার দেশে
বুড়োকে আর ক্লান্ত তার নাককে করে ত্রাণ
মুক্তি দিয়ে রাতের মত
তাদের দুজনাকে।

বুড়ো তখন নাকটি তার ভাজটি করে রাখে
ভুলে গিয়ে ভোরের অভিযান।
[এডোয়ার্ড লিয়রের কবিতার অনুসরণে]

কান্না

ভুপতিকুমার দত্ত

পড়তে বসে হঠাৎ দেখি কেঁদেই ফেলে কঙ্কণাঃ
গল্প কেবল বলেই চলো, একটিও আজ অঙ্ক না।
চাই না ভূগোল পড়তে
কিংবা ছবি আঁকতে
দুঃখভরা গল্প বলো, নয়কো কোন কল্পনা—
যাদের চোখে বন্যা তাদের সত্যি কথা—গল্প না।

খেতে বসেই হঠাৎ দেখি ফুঁপিয়ে ওঠে পান্না,
ভাতের থালা সরিয়ে বলে, কি যে তোমার রান্না!
মাছের মুড়ো খাব না
দুধের বাটি ছোঁব না
যাদের পেটে জ্বলছে আগুন চোখে কেবল কান্না—
তাদের কথা ভাবলে পরে বিষ হয়ে যায় রান্না।

সাজতে গিয়ে কাঁদতে বসে আজকে কেন নন্দিনী?
মেঘের ছায়া মুখের পরে যেন সে কোন্ বন্দিনী!
কপালে টিপ পরবে না
চুলের বেণী বাঁধবে না
যাদের কোন নেইকো পোশাক তাদের কে হয় সঙ্গিনী?
এই কথাটি ভাবতে গিয়ে কাঁদতে বসে নন্দিনী।

দুর্যোগের রাতে

মঞ্জিল সেন

দিনটা ছিল তেরই আষাঢ়। সকাল থেকে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, বৃষ্টির যেন আর বিরাম নেই। বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে ঝোড়ো হাওয়া। জল আর হাওয়ার দাপটে রাস্তার আলো নিভে গেছে, পথঘাট সব অন্ধকার। আকাশের বুক চিরে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির বেগও যেন বাড়ছে। যানবাহন সব বন্ধ, রাস্তার জল হাঁটু ছাড়িয়ে গেছে। কলকাতা শহর বুঝি ডুবে যায়!

বেহালায় দীপকদের বাড়িতে শান্তনু আর বিমল আটকা পড়েছে। দুপুরবেলা ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে তারা এসেছিল দীপকের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। কিন্তু দুর্যোগ যে এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

শান্তনু থাকে আশুতোষ কলেজের কাছে আর বিমল সেই যাদবপুরে। দীপকের মা অবশ্য তাদের রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। তিন বন্ধু বৈঠকখানায় জাঁকিয়ে বসে আড্ডা মারছে। চায়ের সঙ্গে গরম গরম ফুলুরি পরম তৃপ্তির সঙ্গে মুখে পুরে শান্তনু বললে, এই বর্ষার রাতে ভূতের গল্প দারুণ জমে।

ধূমায়িত পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে বিমল বলে, আমি একবার একটা সত্যিকার ভুতুড়ে কাহিনী শুনেছিলাম। আমার দূর সম্পর্কের এক মামাকে অফিসের কাজে একবার মফঃস্বলে যেতে হয়েছিল। সেখানকার ডাকবাংলোতে—

ঠক্! ঠক্! ঠক্!

বিমলের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। এই ঝড়-বাদলের রাত্রে কে আবার এল!

বাইরে অন্ধকার, অবিশ্রান্ত বাদলের ধারা। বৃষ্টির শব্দ আর ব্যাঙের গ্যাঙর-গ্যাঙ এক বিচিত্র সুরের সৃষ্টি করেছে।

ঠক্! ঠক্! ঠক্!

দরজায় আবার সেই শব্দ। দীপকই উঠে দরজাটা খুলে দিল।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র মূর্তি। বেশ ঢ্যাঙা। গায়ে কালো রঙের একটা বর্ষাতি, কলার ওল-টানো থাকায় চিবুক পর্যন্ত ঢাকা। মাথায় একটা টুপি, চোখে কালো চশমা। এত ঝড়-বৃষ্টিতেও কিন্তু ভদ্র-লোকের বর্ষাতিটা শুকনোই বলা চলে, পায়ের রবার সোলের কালো জুতোজোড়া পর্যন্ত পরিষ্কার—জল কাদার চিহ্ন নেই।

ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বললেন, ভেতরে একটু আশ্রয় নিতে পারি? বৃষ্টিটা একটু ধরলেই চলে যাব।

ভদ্রলোকের সান্নিধ্যে দীপকের কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। কিন্তু মুখে ভদ্রতা দেখিয়ে সে ভদ্রলোককে ভেতরে আহ্বান জানাল।

ভদ্রলোক একটা চেয়ার টেনে ঘরের আলোটার দিকে পেছন ফিরে বসলেন। বাইরের রোয়াকে একটা কুকুর গুটিসুটি মেরে শুয়ে ছিল। হঠাৎ কেঁউ কেঁউ করতে করতে পেটের তলায় ল্যাজ ঢুকিয়ে কুকুরটা সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই দৌড় মারল। মানুষের পাঁচটা ইন্দ্রিয়। আর কুকুরের নাকি ষষ্ঠ এক ইন্দ্রিয় আছে। ও কি তবে অন্য কিছুর আঁচ পেয়েছে?

একটা থমথমে ভাব তিন বন্ধুকে যেন বিভ্রান্ত করে তুলল। ভদ্রলোকই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, সেই

ভাঙা ভাঙা কর্কশ কণ্ঠে বললেন, ভূতের গল্প হচ্ছিল বুঝি?

বিস্মিত কণ্ঠে বিমল পাল্টা প্রশ্ন করে, আপনি জানলেন কি করে?

ভদ্রলোক যেন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন, এই বাদলায় ভূতের গল্প যে জমে ভাল!

শান্তনু চমকে ওঠে। একটু আগেই তো সে প্রায় এই কথাই বলেছিল। ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন, তার পর বললেন, শুনবেন একটা সত্যিকার ভৌতিক ঘটনা? আমার নিজের জীবনেই ঘটেছিল।

কারও মুখে কোন কথা নেই। ভদ্রলোক কিন্তু তাদের সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে তাঁর কাহিনী শুরু করলেন।

সে আজ কয়েক বছর আগেকার কথা। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার, তেরই আষাঢ়। সকাল থেকেই আকাশে মেঘের ঘনঘটা, থেকে থেকে কয়েক পশলা বৃষ্টিও হয়েছে। বিকেল চারটের সময় নামল মুষলধারে বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি! চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

অফিসের কাজে আমাকে মেদিনীপুরের কাঁথি শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা গ্রামে যেতে হয়েছিল। ফেরার পথে আমি বৃষ্টির মধ্যে পড়লাম।

সামনেই একটা বড় মাঠ, আশে পাশে কোন বাড়ি চোখে পড়ে না। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। সামান্য যা আলো আছে, তাই ভরসা করে আমি ছুটলাম। কিন্তু ছুটছি তো ছুটছিই, পথ যেন আর শেষ হয় না।

এদিকে যেটুকু আলো ছিল, তাও ক্রমশ মিলিয়ে গেল। চারদিকে শুধু ঘুটঘুট্টি অন্ধকার আর বৃষ্টি আর বৃষ্টি। আমি মহা ফাঁপরে পড়লাম। একটা মাথা গোঁজবার আশ্রয় না পেলে অন্ধকারে পথ হারিয়ে পুকুর বা ডোবায় পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

কতক্ষণ ছুটেছি হুঁশ নেই, হঠাৎ অন্ধকার আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, আর আমি দেখলাম, একটা পুরনো বাড়ির ঠিক দোরগোড়ায় এসে আমি পৌঁচেছি।

ঈশ্বরকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আমি দরজায় ঘন ঘন করাঘাত করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে দরজার কপাট দুটো খুলে গেল। কিন্তু অন্ধকারে আমি কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। যে দরজা খুলে দিয়েছিল, তাকে লক্ষ্য করে আমি রাত্রের জন্য আশ্রয় চাইলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! দরজার ও পাশ থেকে কোনও সাড়াশব্দ এল না, কিংবা কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কি না তাও আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

কি করব ভাবছি, এমন সময় একটা ঘরে যেন ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পেলাম। সেই আলো লক্ষ্য করে আমি এগিয়ে গেলাম।

একটা বেশ প্রশস্ত ঘর, মেঝের উপর একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে। ঘরের একপাশে একটা তক্তপোশ। তক্তপোশের উপর একজন যুবা বয়সের ছেলে শুয়ে আছে আর তার মাথার কাছে ঘোমটায় মুখ ঢাকা একটি বৌ হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধ।

আমার উপস্থিতি কেউ যেন লক্ষ্যও করল না। আমি পায়ে পায়ে শয্যার পাশে এগিয়ে গেলাম। যে যুবকটি শুয়ে ছিল, তাকে গুরুতর অসুস্থ মনে হল—মুখটা পাণ্ডুর, চোখদুটো বন্ধ।

আমি বৃদ্ধকে সম্বোধন করে অসুখের বৃত্তান্ত জানতে চাইলাম। কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাতও করলেন না, তাঁর দৃষ্টি রোগীর পরেই নিবদ্ধ।

আমি এবার গলা খাঁকারি দিলাম। কিন্তু তার পরিণাম হল বিপরীত। বৃদ্ধ এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর কোটরে বসে যাওয়া চোখদুটি তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমাকে যেন বিদ্ধ করতে লাগল। কী ভয়ানক সেই দৃষ্টি! আমি সরে এলাম।

তারপর কখন যে মাটিতে ধুলোর ওপরেই বসে পড়েছি এবং সারা দিনের পরিশ্রমে ঝিমুতে শুরু করেছি, তা নিজেরই খেয়াল নেই। হঠাৎ যেন ইন্দ্রিয়ের কোন সূক্ষ্ম অনুভূতিতে ঝিমুনিটা কেটে গেল আর আমি শয্যার দিকে তাকালাম।

কিন্তু এ কী! দু চোখ রগড়ে নিয়ে আমি আবার শয্যার দিকে তাকালাম। শয্যায় শুয়ে আছেন সেই বৃদ্ধটি আর পাশে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেই ছেলেটি। বৃদ্ধটির চোখ দুটি বোজা—ঠিক যেমনটি ছেলেটিকে দেখেছিলাম। আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না প্রথমবার ভুল দেখেছিলাম!

আমার গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ হল আর সেই শব্দে বোধহয় বিরক্ত হয়ে যুবকটি আমার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাল। সে কী তীব্র দৃষ্টি, যেন ছুরির ফলার মত অন্তরের মর্মস্থলে গিয়ে বেঁধে! আমি ভয়ে চোখ বুঝলাম।

আবার হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সহসা ঘুম

ভেঙে গেল। শয্যার দিকে চোখ পড়তেই এবার আমার সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। শয্যায় এবার বৃদ্ধটি নেই, প্রথমবার তাকে যে অবস্থায় দেখেছিলাম, তিনি সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন। শয্যায় কিন্তু যুবকটিও নেই। সেখানে বধূটি শুয়ে আছে আর তার শিয়রে বসে পাখা করছে যুবকটি। বধূটির মুখ মৃতের মত পাণ্ডুর।

আমার মনে বিদ্যুৎ-চমকের মত একটা প্রশ্ন জাগল—তবে কি আমি অজান্তে একটা ভূতুড়ে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি! কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

যখন জ্ঞান হল, তখন ভোর হয়েছে। আমি ঘরে একা শুয়ে আছি, আর কেউ নেই। আর আশ্চর্য, আমার শরীরটা খুব হালকা বোধ হতে লাগল।

পরে জানতে পেরেছিলাম যে, ঐ তারিখেই এক দুর্যোগের রাতে কলেরায় সেই বাড়ির বৃদ্ধ মালিক, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ বিনা চিকিৎসায় মারা যায় বৃষ্টি-বাদলের জন্য কোন ডাক্তারই পাওয়া যায়নি তারপর থেকেই নাকি দুর্যোগের রাত্রে ঐ বাড়িতে তাদের দেখতে পাওয়া যায়।

ভদ্রলোক থামলেন। ঘরের মধ্যে একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। তিন বন্ধু পরস্পরের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। একটা আতঙ্ক যেন তাদের কণ্ঠরোধ করেছে। কয়েক মুহূর্ত এই ভাবে কেটে যায়। হঠাৎ তারা ফিরে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বয়ে গেল। চেয়ারটা শূন্য!

বাইরে বৃষ্টিটাও তখন বেশ ধরে এসেছে।

কি ব্যাপার? এ কি কারও কারসাজি? কোন ভোজবাজি? তিনজনের কারো মুখে কথা নেই। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তারা।

গল্পের যাদুঘরে ● অম্লমধুর

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে লিখেছেনঃ সূর্যমুখী যখন জানতে পারল যে তার স্বামী বিধবা কুন্দনন্দিনীকে আবার বিয়ে করছেন, তখন সে মনের দুঃখে সব কথা জানিয়ে তার ননদকে এক চিঠি দেয়। সূর্যমুখী সেই চিঠিতে লেখে, কলকাতার কে একজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলে পণ্ডিত আছেন, তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য আন্দোলন করছেন। মূর্খ না হলে কেউ এ কাজ করার জন্য উদ্যোগী হতে পারেন?

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিধবা-বিবাহ প্রচলনের বিরোধী। তাই এই কথাগুলো তিনি সূর্য-মুখীকে দিয়ে বলিয়েছেন।

যাই হোক্। একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ধমানে বেড়াতে গিয়ে বন্ধু প্যারীচাঁদ-বাবুর বাড়িতে উঠলেন। খবর পেয়ে বর্ধমানের অন্যান্য বন্ধুরাও সেখানে হাজির হলেন। তারপর সবাই মিলে তাঁকে রেঁধে খাওয়াতে অনুরোধ করলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহাস্যে রাজী হলেন। আরেক বন্ধু দিগম্বর বিশ্বাসের বাড়ীতে হলো রান্নার বন্দোবস্ত।

ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন বর্ধমানের স্পেশাল সাব্-রেজিস্ট্রার। আবার সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই ছিলেন দিগম্বর বিশ্বাসের বন্ধু। তাই দুজনেই নিমন্ত্রিত হলেন সেই খাওয়ার আসরে।

যথাসময়ে সকলে খেতে বসেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই পরিবেশন করছেন। খাওয়ার শেষে সবার পাতে অম্বল দেওয়া হল। বঙ্কিমচন্দ্র একটু খেয়েই বলে উঠলেন—বা! চমৎকার! সঞ্জীবচন্দ্র বললেন, কার রান্না দেখতে হবে তো! স্বয়ং বিদ্যাসাগরের।

বিদ্যাসাগর মুচকি হেসে বললেন, না হে, আমি তো মূর্খসাগর। বঙ্কিমের সূর্যমুখীর মতে তো আমি একজন মূর্খ।

কথাটা শুনেই সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও মৃদু হাসলেন।

—অভিজিৎ গুহ

জলা ও সাপ

চুনীলাল রায়

পালামৌ-তে আর কিছু থাক না থাক, এর নামের প্রথম অক্ষর-ই জানিয়ে দেয় 'পা'-তে পাহাড় আছে। সত্যিই তাই, চারদিকে কেবল পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়।

আর পাহাড়গুলিও কেমন যেন অদ্ভুত। সবুজ ঘাসে ঢাকা, কিন্তু তার নীচেই লাল পাথর চোখে পড়ে।

পালামৌ-তে গিয়ে অরণি-র সবচেয়ে প্রথমে এই জিনিসটাই নজরে পড়েছিল বেশী করে।

কি করে পালামৌ-তে যেতে হয়, সে কথা একটু বলি। ডিহিরী-অন-শোন থেকে গাড়ী বদল করে ব্রাঞ্চ লাইনে আসতে হয় গারওয়া রোড্ যার দেহাতী নাম রেহলা। সেখান থেকে আবার গাড়ী বদল করে আসতে হয় পালামৌ জেলার সাব-ডিভিশনাল শহর গারওয়াতে। অবশ্য রেহলাও পালামৌ জেলাতেই অবস্থিত।

কিন্তু অরণির কাজের জায়গা ছিল কৈলান। জায়গাটা বড় দুর্গম। কৈলান গারওয়া থেকে কম করেও পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। আর গারওয়া থেকে সপ্তাহে একদিনই কেবল ওখানে জীপে করে খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র এবং ডাক পৌঁছে দিয়ে আসা হয়।

কৈলান থেকে অবশ্য আরও অনেক দূরে ভবনাথপুর। সমতলভূমি থেকে কম করেও হাজার দেড়েক ফুট ওপরে জায়গাটা। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে অতি কষ্টে ওখানে পৌঁছাবার পথ করে নেওয়া হয়েছে। আর এই ভবনাথপুরেই—

হ্যাঁ, আর এই ভবনাথপুরেই আজ পাওয়া গিয়েছে মহামূল্য লাইম স্টোনের বিরাট উৎকৃষ্ট সঞ্চয়। তা ছাড়াও এখানে পাওয়া গিয়েছে হিমাটাইট, ডলোমাইট প্রভৃতি আরও কিছু কিছু মহামূল্যবান খনিজ পদার্থ।

বোকারো স্টীল প্ল্যান্টে চুনাপাথরের এই সম্পদ পৌঁছে দেবার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে রেলপথ তৈরির কাজে এগিয়ে এসেছেন।

গারওয়াতেই বসেছে 'কন্‌স্ট্রাকশন'-এর হেড অফিস। আর আপাততঃ হাজার ফুট উঁচু কৈলানে দু-চারটে তাঁবু পেতে এই কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য লোক রাখা হয়েছে।

এই কাজেই অরণি গিয়েছিল কৈলান। চারপাশের পাহাড়ের রাজত্বের মধ্যে একটা সমতল জায়গায় দু-চারটে তাঁবু পাতা হয়েছিল একটু দূরে দূরে।

তার ওখানে রান্নার কাজ করত বৃদ্ধ রামখেলাওন। তার কাছ থেকেই এক 'ক'হনীয়া' শুনে অরণির মনে জেদ চেপে যায়।

রামখেলাওনের কাহিনীটা বেশ মজার—

কোয়ার্টারের সামনে সিকি মাইলের মধ্যে যে পাহাড়টা চোখে পড়ে, তার নাম 'টাইগার হিল্‌স'। আর সেই প্রাচীন কাহিনীটার মূল ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে এই পাহাড়কে কেন্দ্র করেই।

সে কবেকার কথা, তা আজ আর কেউ বলতে পারে না। কিন্তু যাকে নিয়ে ঐ গল্প, তার বংশধররা আজও রয়েছেন।

হ্যাঁ, কৈলানের রাজকুমারকে নিয়েই এই গল্প। সুন্দর, সুদর্শন, তরুণ কুমার প্রায়ই তাঁর সাদা রঙের বিরাট তেজী ঘোড়ায় চেপে নিজের রাজত্বের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতেন।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে তিনি কৈলান নদীর উজান পথ ধরে চলেছেন। এখানে পাহাড় বড় অদ্ভুত—একটা

শাণিত তীরের ফলা

ভৈরবপ্রসাদ হালদার

ধারাবাহিক উপন্যাস • পূর্বপ্রকাশিতের পর

সকলে মন্দিরের চত্বরে গিয়ে পেঁাছলো।

মন্দিরের ভিতরে উজ্জ্বল প্রদীপের আলো। সার সার অনেকগুলো প্রদীপ জ্বলছে। ভগবান বুদ্ধের শ্বেত-পাথরের সুবিশাল মূর্তি—ধ্যানস্থ। সামনে থালায় সাজান প্রসাদ এবং সাদা ফুলের স্তবক।

একজন ভিক্ষু-প্রহরী এগিয়ে এল।

তার হাতে ঘোড়ার লাগাম দিয়ে শ্রবণদেব শুধাল—মহাস্থবির কোথায় আছেন?

—পূজারতি শেষ করে বজ্রকুটিরে গিয়েছেন।

শ্রমণদেব সংগের ভিক্ষু-প্রহরীদের নির্দেশ দিল—বন্দীকে নিয়ে এখানে অপেক্ষা করো। মহাস্থবিরের সংগে দেখা করে আসছি।

ওদের সংগে দাঁড়িয়ে রইল বন্দী সৈনিক।

মন্দিরের বাইরে দুটো মশাল জ্বলছে। আলোক-বৃত্তের বাইরে জমাট অন্ধকার। মন্দিরের ওপাশে কি আছে, চোখে পড়ছে না। তবে মনে হচ্ছে, পাহাড়ের কোলে এই বিশাল মন্দির তৈরি করা হয়েছে। হয়তো পাহাড় কেটেই তৈরী হয়েছে মন্দিরের ভিত। ওপাশে ভিক্ষুদের থাকবার ঘর থাকাও অসম্ভব নয়।

এটাই কি তোমাদের বিহার?—বন্দী জিজ্ঞাসা করলো।

হ্যাঁ।—জবাব দিল প্রহরীদের একজন।

বন্দীর মোটেই ভাল লাগছে না ব্যাপারটা। অসন্তুষ্ট ক্ষুব্ধ সে মনে মনে। এ কোথায় এরা তাকে ধরে এনেছে? আর ধরে আনলোই বা কেন? মহারাজার কাজের ভার রয়েছে তার ওপর। গুরুতর কাজ। সেনানায়ক হুকুম করেছে, ঠিক সময় রাজধানীতে খবর পেঁাছান চাই। এতটুকু দেরী হলে রাজ্যের ঘোর বিপদ হবে। কিন্তু এদের হাতে সে বন্দী এখন—রাজধানীতে কবে কখন পেঁাছাবে, জানে না।

বন্দী গভীর চিন্তায় ডুবে যায়।

মণ্ডলা দুর্গের মহানায়ক রোহিতাশ্বদেব বিশেষ বার্তা দিয়ে তাকে রাজধানীতে পাঠিয়েছেন। মণ্ডলা সীমান্তের একটা দুর্গ। শক্ত ঘাঁটি। ওখান থেকে রাজধানী কর্ণসুবর্ণ দুদিনের পথ। কিন্তু দুদিন তো সময় দেওয়া যাবে না। রাজপথের ধারে ধারে সৈনিক ঘাঁটি আছে। সে-সব ঘাঁটিতে ঘোড়া বদল করে আর গড়-জংগলের রাস্তা ধরে রাজধানী পেঁাছতে হবে একদিনেই।

কিন্তু কে যাবে?

বিষেণদেব একজন তরুণ ঘোড়সওয়ার।

মহানায়ক তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। এর পক্ষে যাওয়া সম্ভব। বললেন—খুব জরুরী কাজ। গোপনীয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজধানীতে যেতে হবে—খুব সাবধানে। পারবে ত?

—পারবো, মহানায়ক।

পাহাড় শেষ হবার পর তার একটু পিছনেই আর একটা নতুন পাহাড় শুরু হয়েছে।

আর ঘুরতে ঘুরতে নদীর উজান পথে তিনি ঐ পাহাড় ধরে উপরে উঠতে লাগলেন। সেদিন কেন যে এই পাহাড়ী নদীতে জলের স্রোত কম ছিল, তা আজ কেউ বলতে পারে না।

যাই হোক, এভাবে পথে যেতে যেতে রাজকুমারের চোখে পড়ল একটা অদ্ভুত জিনিস। কোন এক অজানা, অচেনা, অদেখা নারীর একটা দীঘল কেশ নদীর জলে ভেসে চলেছে! এই সুন্দর কেশ দেখই রাজকুমার বিমোহিত হয়ে গেলেন। ভাবলেন, এই চুল যার সে না জানি কত সুন্দর হবে।

ব্যস, কথাটা মনে হতেই সেই নারীকে দেখবার জন্য তাঁর মন আকুল হয়ে উঠল। কিন্তু ঘোড়া পাহাড়ী খাড়াই পথে আর উঠতে পারছিল না, তাই তাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি একাকী পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

রাজকুমারের প্রিয় ঘোড়া আস্তে আস্তে গভীর বনপথে কোথায় হারিয়ে গেল, তা নজরে পড়ল না।

দীর্ঘ পথ হাঁটার পর রাজকুমারের কষ্ট যেন সার্থক হল। দেখলেন, এক অপূর্ব সুন্দরী, স্বর্গীয় দেব-কন্যা যেন নদীর জলে কাপড় কাচছে। কিন্তু তার পরিধেয় দেখেই বোঝা গেল যে, সে চামার কন্যা। তবুও তাকে পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন রাজকুমার।

তার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু তার আগেই সেই ভীতা সুন্দরী পালাতে শুরু করেছে। রাজকুমারও এবার পিছন পিছন দৌড়ান শুরু করলেন। সেই সুন্দরী তখন সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেউ সে ডাক শুনল না এবং তার সাহায্যের জন্যও এগিয়ে এল না। আর অল্প দূর গিয়েই রাজকুমার তাকে ধরে ফেললেন।

যে জায়গাটায় তারা এসে পড়েছিলেন, সেটাই ছিল পাহাড়ের চুড়ো। চুড়োটা কিন্তু অদ্ভুত—ওখানে বেশ কিছুটা সমতল জায়গাও রয়েছে।

এখন, চামার কন্যাকে ধরে ফেলার সাথে সাথেই সে বিবশ হয়ে পড়ে গেল। আর রাজকুমারকে এই অভিশাপ দিল যে, এই পাহাড়ের কাছে এর পর যে আসবে তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং এই কৈলান রাজার রাজত্বে কোন চামার থাকবে না।

অল্পক্ষণ পরেই চামার কন্যা মারা গেল। আর তার মৃত্যুস্থানে একটা জলপূর্ণ জলাশয়ের সৃষ্টি হল।

এই জলাধারটি বড়ই আশ্চর্যজনক। সারা বছর খরা হলেও জলাধারের জল ঠিকই থাকে। আর সেই আদ্যিকাল থেকে ঐ জলাধারে বাস করছে একটা সাপ

তারপর অনেক—অনেক দিন কেটে গেল। পাহাড়ের ভীতিটাও একদিন শেষ হল। এখন প্রতি বছর ভদ্র সংক্রান্তিতে ঐ পাহাড়ের রাজত্বে ঐ জলাধারকে কেন্দ্র করে বিরাট সেই জঙ্গলের দেশে এক ছোটখাটো মেলা বসে থাকে।

কিন্তু আজও কৈলানে একজন মুচির দেখা পাওয়া যায় না। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, বছরের ঐ দিনটিতেই কেবল সাপটি জলাধার ছেড়ে বের হয়ে এসে তার জন্য রাখা দুধ-কলা খেয়ে থাকে।

সেদিন তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পাহাড়ে চড়ার আকর্ষণটা অরণিকে যেন পেয়ে বসেছিল। এই পাহাড়ের কেমন যেন একটা অলৌকিক আকর্ষণ আছে। পাহাড় যেন দু বাহু বাড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

দুর্বার তারুণ্যের তেজে ঐ কষ্টকর খাড়াই পথ উঠে অরণিও দেখে এসেছে সেই জায়গাটা। জলাশয়ের সাপটাকে নির্জীব হয়ে পড়ে থাকতে দেখে সে আশ্চর্য হয়েছে। বাইরে যখন বৃষ্টি নেই, তখন ওখানে জলাধার ভর্তি জল দেখে আরও অবাক হয়েছে সে।

বিজ্ঞানের ছাত্র অরণি কোন যুক্তিতর্ক দিয়েই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে নি।

যতবারই সে কোন যুক্তির পথ ধরে এগিয়ে যেতে চেয়েছে, ততবারই পাহাড় যেন তীব্র ভ্রূকুটি করে তার সে ভাবনার ইতি টেনে দিয়েছে।

অরণি আজও এই জলা ও সাপ কিছুরই কোন সমাধান করতে পারে নি। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে অলৌকিক বলেই মনে হয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি, ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে এমন আরও অনেক কিছু ছড়িয়ে আছে, যেগুলিকে আজও হেঁয়ালি বলে মনে হয়। ভবিষ্যতে হয়ত থাকবে না।

ঘটনাটা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যি। তোমরা যদি কোন দিন ওখানে যাও, তবে ঐ জায়গাটা দেখে এস। আর কোন সমাধান খুঁজে পেলে আমাকে জানিও।

তুমি কি কোন দিন এর আগে একলা এভাবে রাজধানী গিয়েছ?

—না, মহানায়ক।

—তাহলে কি চিনে যেতে পারবে?

বিষেণদেব পারবে, মহানায়ক। আমি ওকে রাস্তা বলে দিচ্ছি।—বললেন নায়ক হরিসেন।

তাহলে, এই বস্ত্রখণ্ডে সমস্ত বার্তা লেখা আছে, এটি ওর পোশাকের ভিতর সেলাই করে দাও। কেউ বুঝতে পারবে না, কি কাজে ও রাজধানী যাচ্ছে।—বলে মহানায়ক একখণ্ড বস্ত্র নায়কের হাতে দিলেন।

তারপর ক্ষণকাল চিন্তা করে মহানায়ক আবার বলেছিলেন— দেখ বিষেণদেব, অত্যন্ত গোপনীয় রাজ-কাজ। মনে থাকে যেন, প্রাণ দিয়েও এর গোপনীয়তা রাখতে হবে। রাজধানীতে পৌঁছেই মহাবলাধ্যক্ষের হাতে এটি দেবে।

—আপনার আদেশ প্রাণ দিয়ে পালন করবো মহা-নায়ক।

—তোমার যাওয়ার পথে গড়জঙ্গল পড়বে। জঙ্গলে শুধু হিংস্র পশু নেই, দস্যুর ভয়ও আছে। সাবধানে যাবে। অবশ্য রাজকাজে যাচ্ছ শুনলে কোনও দস্যু তোমার পথ আটকাবে না। আটকাতে সাহসও করবে না। নায়ক, বিষেণদেবের যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দাও।

মহানায়কের হুকুমনামা আর বার্তা নিয়ে মণ্ডলা দুর্গ থেকে রওনা হয় বিষেণদেব। পথে প্রহরী-ঘাঁটি থেকে দুবার ঘোড়া বদল করেছে। মণ্ডলা দুর্গের মহানায়কের হুকুমনামা দেখাতেই প্রহরী-ঘাঁটির নায়ক ঘোড়া বদলাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ওহে, চলো আমার সঙ্গে!—ভিক্ষু শ্রমণদেব ফিরে এসে বললো।

কোথায়?—চমকে উঠে শুধাল বন্দী।

—মহাস্থবিরের কাছে।

—কেন? মহাস্থবিরের কাছে যাব কেন? আমি রাজকাজে রাজধানী যাচ্ছি। ছেড়ে দাও আমাকে, নইলে বিপদে পড়বে।

—বিপদের ভয় ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দেখিও না। আমরা মরতে ভয় পাই না!

ভিক্ষু-সঙ্ঘ! একটু অবাক হলো বিষেণদেব। এখানে ভিক্ষু-সঙ্ঘ এল কি করে? উত্তর ভারতে এমন সৈনিক নেই, যে ভিক্ষু-সঙ্ঘের নাম না শুনেছে। বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমর্থনে এই ভিক্ষু-সঙ্ঘ আজ প্রবল শক্তি-মান। পাটলিপুত্রের কাপোতিক সঙ্ঘের মহাস্থবির বুদ্ধঘোষ হচ্ছে এই সব ভিক্ষু-সঙ্ঘের নেতা। পেশায় বৌদ্ধ শ্রমণ হলেও এরা অত্যন্ত নৃশংস, হিংস্র। হিন্দুদের হত্যা করতে এরা এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু এই ভিক্ষু-সঙ্ঘ গড়জঙ্গলে এল কি করে? মহারাজ শশাঙ্ক হিন্দু নরপতি ও হিন্দু ধর্মের সমর্থক হলেও রাজ্যের বৌদ্ধদের উপর কোন অত্যাচার করেন না। হিন্দু ও বৌদ্ধে কোনও বিরোধ নেই। তাই মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্যে তো ভিক্ষু-সঙ্ঘের থাকবার কথা নয়।

কি হলো? এগিয়ে চলো!—কঠোর কণ্ঠে হুকুম করলো শ্রমণদেব।

—হ্যাঁ। চলো।

অন্ধকারে পা বাড়ায় বিষেণদেব। মাথায় তার চিন্তার স্রোত।

মহানায়ক অবশ্য বলেছিলেন যে, গড়জঙ্গলে দস্যুর ভয় আছে। তাহলে এরাই কি সেই দস্যু? জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকে। তারপর লোকজন দেখলে বর্শা আর তীর উঁচিয়ে তাকে বন্দী করে। আর যারা পালাবার চেষ্টা করে তাদের তীর দিয়ে বিঁধে ফেলে। কিন্তু কেন? ভিক্ষু-সঙ্ঘ কেন এই গড়জঙ্গলে বসে ডাকাতি করছে? ওদের কি উদ্দেশ্য?

মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্যের মধ্যে এরা এমন জঘন্য কাজ করছে কোন্ সাহসে? সেনাবাহিনী জানে না—তাই এই সাহস। নিরীহ চেহারার এই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যে দিনের পর দিন এমন জঘন্য কাজ করছে, করে চলেছে—সেনা-বাহিনী তা জানতেও পারছে না। গড়জঙ্গলে সাধারণ দস্যুদের ভয় আছে—শুধু এইটুকুই খবর জানে রাজধানী। এখান থেকে রাজধানীতে ফিরে মহাবলা-ধ্যক্ষকে সব কথা বলতে হবে। মনে মনে সঙ্কল্প করে বিষেণদেব।

অন্ধকারেই মন্দির ঘুরে ওরা পিছন দিকে এল। মন্দিরের পিছনে পাথর-বাঁধানো চত্বর। সারি সারি মশাল জ্বলছে।

মুণ্ডিত মস্তক অনেক মানুষ চত্বরে বসে আছে। সবাইকে দেখা যাচ্ছে না। তবে বিষেণদেব বুঝতে পারছে, চত্বর ভরে গেছে ভিক্ষুতে। ওরা নিঃশব্দে সামনে তাকিয়ে বসে আছে। চত্বরের শেষ প্রান্তে একটা উঁচু বেদী। ওখানে কে একজন বসে আছে। দূর থেকেই বুঝতে পারে বিষেণদেব—ওই লোকটাই এই ভিক্ষু-সঙ্ঘের নেতা।

ভিক্ষুদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে এসে ওরা বেদীর সামনে থামলো।

বেদীর উপর গেরুয়া কাপড় পাতা। তার উপর সোজা হয়ে বসে আছে একজন মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষু। সামনে একখানা ভূর্জপত্রের পুঁথি খোলা। একটি প্রদীপ জ্বলছে। বেদীর পিছনে একজন সশস্ত্র ভিক্ষু দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভিক্ষু-নায়ক মুখ তুলে তাকালো।

তার দুচোখে ক্রুর দৃষ্টি।

এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কোথায় কি প্রয়োজনে যাচ্ছিলে ?—নীরস কণ্ঠে শুধাল ভিক্ষু-নায়ক।

—রাজধানী যাচ্ছিলাম। প্রয়োজনের কথা বলতে বাধ্য নই।

ভিক্ষু-নায়ক হাসলো মৃদু হাসি। ক্রুর মুখ-মণ্ডল যেন আরো বীভৎস হয়ে উঠলো।

—কিন্তু তোমার প্রয়োজনের কথা আমাদের জানা দরকার।

বারেকের জন্য চিন্তা জাগে বিষেণদেবের মনে। রাজধানীতে গোপনীয় রাজকাজে যাচ্ছিল ও। কিন্তু তা ত বলা যাবে না। কিন্তু এদের হাত থেকে ছাড়া পেতে হলে একটা কিছু বলতেই হবে। কি বলবে?

জবাব দাও! বলো কি প্রয়োজন ?—গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করলো ভিক্ষু-নায়ক।

—নিজের বাড়ীতে যাচ্ছিলাম। রাজধানীর কাছেই আমার বাড়ী।

—কোথা থেকে আসছো ?

—মণ্ডলা থেকে।

—মণ্ডলা দুর্গের সৈনিক তুমি ?

বিষেণদেব জবাব দেয় না।

—তুমি মিথ্যা বলছো সৈনিক। রাজকাজে তুমি রাজধানীতে যাচ্ছিলে!

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ভিক্ষু-নায়ক। প্রশ্ন করে করে জানতে চায়—বার্তা আছে কি-না, পত্র আছে কি-না। কোনও জবাব দেয় না বিষেণদেব। মৃত্যুর ভয় দেখায়। কিন্তু নির্ভীক বিষেণদেব সবকিছুই অস্বীকার করলো।

শেষে ভিক্ষু-নায়ক হুকুম দিল—সৈনিকের দেহ খুঁজে দেখ, কোনও কিছু পাও কি-না!

ভিক্ষু-সৈনিকরা ওর দেহ খুঁজলো তন্ন তন্ন করে।

কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই।

ভিক্ষু-নায়ক যেন ক্ষেপে গেল। হিংস্র-কণ্ঠে বললো—বন্দী, কি বার্তা নিয়ে যাচ্ছ, বলো। নইলে ভয়ঙ্কর পরিণতি অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।

—আমাকে মরণের ভয় দেখিও না। মরতে আমি ভয় পাই না।

সে মরণের কথা তুমি কল্পনাও করতে পারছো না। —কঠোর কণ্ঠে বললো ভিক্ষু-নায়ক।

—জানি তোমরা নিষ্ঠুর। তোমরা দস্যু। তোমাদের কাছে মানুষের প্রাণের কোন মূল্য নেই। ভিক্ষুর বেশে তোমরা শয়তান। বুদ্ধদেবের নামে তোমরা......

থাম!—বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিল ভিক্ষু-নায়ক। চত্বরে উপবিষ্ট সব কটি মানুষ চমকে উঠলো।

হাহা শব্দে হেসে উঠলো বন্দী বিষেণদেব—তোমাদের স্বরূপ জানতে পেরেছি বলে ভয় পেয়ে গেছ, তাই না?

তোমার মুখ আমি চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেব।—বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ভিক্ষু-নায়ক। শীর্ণ দীর্ঘ চেহারা। পরনে চীর। মুণ্ডিত মস্তক। দুচোখে ক্রুর দৃষ্টি। শার্দুলের চেয়েও হিংস্র মুখমণ্ডল।

দেশের শত্রু তোমরা। রাজার শত্রু।—আবেগে কণ্ঠরোধ হলো বিষেণদেবের।

—নিয়ে যাও বন্দীকে। কাল প্রভাতে উত্তপ্ত তৈল-কটাহে বন্দীর দেহ নিক্ষেপ করা হবে।

দুদিক থেকে দুজন ভিক্ষু-সৈন্য এসে বিষেণদেবের হাত চেপে ধরলো। ওকে টেনে নিয়ে চললো বেদীর পিছন দিকে অন্ধকারের মধ্যে।

বিষেণদেবের কপালে গাঢ় চিন্তার রেখা। কাল সকালে গরম তেলের কড়ায় ওরা তার দেহ ছুঁড়ে ফেলে দেবে। মরণকে ও ভয় পায় না। কারণ ও সৈনিক। মরতেও জানে আবার মারতেও পারে। কিন্তু মরবার আগে যদি রাজকাজটা করে যেতে পারতো! ওর পোশাকের সঙ্গে বস্ত্রখণ্ডটা সেলাই করা আছে। তার সন্ধান ভিক্ষুরা পায় নি। ওখানা কোন রকমে একবার রাজধানীতে মহাবলাধ্যক্ষের কাছে পেঁৗছে দিতে হবে।

পাহাড়ের গায়ে সারি সারি ঘর। অন্ধকারে সবটা দেখতে না পেলেও বিষণদেব বুঝতে পারলো, পাহাড় কেটে গুহা-ঘর তৈরি করেছে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। বিহারের ভিক্ষুরা এই ঘরের মধ্যেই থাকে।

একখানা ঘরের মধ্যে তাকে ঠেলে দিয়ে ওরা দরজা বন্ধ করে দিল।

রাত গভীর হয়েছে।

বাইরের সাড়াশব্দ থেমেছে। বৌদ্ধ-বিহারের ভিক্ষুরা এখন ঘুমে অচেতন। ঘরের মধ্যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না বিষেণদেব। অনেক উঁচুতে একটা ঘুলঘুলি। ওটা হাওয়া বেরোবার পথ। তবে নীচ থেকে মনে হচ্ছে বেশ বড়—ঢাকনা নেই। ঘুলঘুলি দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটুখানি ঝক্‌ঝকে আকাশ। হয়তো চাঁদ উঠেছে বাইরে।

আন্দাজে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো বিষেণদেব।

দেওয়ালের উপর ঘুলঘুলির দিকে তাকালো। এখান থেকে পালাবার ওই একমাত্র পথ। ওখানে ওঠা দুঃসাধ্য, কিন্তু তবু চেষ্টা করতে হবে। এমনিভাবে নিঃশব্দে এই ঘরের মধ্যে পড়ে থাকবে না বিষেণদেব। এখানে থাকলে কাল সকালে তেলের কড়াইতে ওর দেহ ফোটাবে ভিক্ষুরা। বাঘের চেয়েও এরা হিংস্র। তাছাড়া যেমন করে হোক আসছে কাল রাজধানীতে পেঁছিতেই হবে।

কিন্তু এ ঘর থেকে বেরোলেই কি পালাতে পারবে বিষেণদেব? ভিক্ষু-প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গভীর জঙ্গলে ও না হয় ঢুকতে পারবে। কিন্তু তারপর? ঘোড়াটা ওরা কেড়ে নিয়েছে। পায়ে হেঁটে এই গভীর জঙ্গল পার হয়ে সেই রাজপথে পেঁছিতে হবে। তারপর ফিরে যেতে হবে সেই আগেকার প্রহরী-ঘাঁটিতে। ভিক্ষু-সঙ্ঘের খবর পাঠাতে হবে মণ্ডলা দুর্গে। আর নতুন একটা ঘোড়া নিয়ে আবার ছুটতে হবে কর্ণসুবর্ণের পথে।

বিষেণদেব অনেক কথা এক সঙ্গে চিন্তা করলো। চিন্তার পোকাগুলো তার মাথার ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। তাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

সব কাজই করবে বিষেণদেব, যদি জঙ্গলের মধ্যে পথ না হারিয়ে আজ রাতেই সেই রাজপথে পেঁছিতে পারে।

অন্ধকারে দেওয়ালের উপর হাত বুলোতে লাগলো বিষেণদেব। বড় বড় পাথরের টুকরো সাজিয়ে দেওয়াল গাঁথা। মসৃণ নয়—এবড়ো-খেবড়ো। উপর দিকে একটা কিছু ধরতে পারলে পাথরের খাঁজে পা রেখে উঠে দাঁড়ানো যায়। কিন্তু উপর দিকে আঁকড়ে ধরবার মতন তো হাতে কিছু ঠেকছে না।

বিষেণদেব দেওয়ালের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে এগিয়ে চললো।

সহসা শক্ত একটা কিছুর সঙ্গে তার পায়ের ধাক্কা লাগলো। বেশ জোরেই ধাক্কা লাগলো।

আঃ! কে গো?—অন্ধকারেই একটা কণ্ঠস্বর কাকিয়ে উঠলো।

আমি।—ফিস্‌ফিস্ করে বললো বিষেণদেব।

—আমি? আমি কে?

—আমি একজন বন্দী।

—ও, তাই বলো। এই ভিক্ষুগুলো ধরে এনেছে বুঝি?

হাঁ। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?—অবাক কণ্ঠে শুধাল বিষেণদেব। ওর প্রশ্ন আর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে যে, লোকটা এখানকার হালচাল সব জানে। অথচ ভিক্ষুদের উপর চটা। কিন্তু জানলো কি করে? লোকটা এই বিহারের কেউ কি? কিংবা এদের হাতে তারই মতন একজন বন্দী?

—জানবো না কেন হে? আমাকেও যে ধরে এনেছে!

—কেন? তোমাকে ধরলো কেন? তুমি কি সৈনিক?

অন্ধকার ঘরে লোকটার মুখ দেখতে পাচ্ছে না বিষেণদেব। কিন্তু ওর কথা শুনে বুঝতে পারছে যে, ও খুব ক্লান্ত। জোরে কথা বলতেও ওর কষ্ট হচ্ছে! হাঁফাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ থেমে লোকটি বললো—আমি ভিক্ষু হতে চাইনি বলে ওরা আমাকে ধরে এনেছে। এখানে আটকে রেখেছে।

তা তোমাকে ভিক্ষু করে ওদের লাভ? দেশে তো আর লোকের অভাব নেই।—বিষেণদেব শুধাল। জোর করে ভিক্ষু করার উদ্দেশ্য কি, তা বুঝতে পারলো না।

বনের সীমানায় নদীর ধারে একটা মস্ত বড় গঞ্জ আছে। ওখানে আমার বাড়ি। জমি-জমা, ধন-রত্ন সবই আছে আমার, পৈতৃক ব্যবসা থেকে বহু আয় হয়। এরা আমাকে ভিক্ষু করতে চেয়েছিল। আমি যদি চীর নিয়ে এদের বিহারে চলে আসি, তাহলে আমার জমি-জমা, বাড়ি-ঘর, ধন-রত্ন সব এরা পাবে।—একনাগাড়ে কথা বলে লোকটি থামল। ও হাঁফাচ্ছে।

বিষেণদেব বুঝতে পারলো, এরা কেবল দস্যু নয়—এরা গ্রাম ও গঞ্জ থেকে লোকজন ধরে নিয়ে আসে। তাদের জোর করে বৌদ্ধ-ভিক্ষু করে। সোজা কথায় ভিক্ষু না হলে অত্যাচারও করে। তবে কি তাকেও এরা ধরে নিয়ে এসেছে বৌদ্ধ-ভিক্ষু করার জন্যে? খবর জানতে চাওয়াটা একটা ছল!

সহসা জোরে হেসে ওঠে বিষেণদেব।

এ কি হাসছো কেন? পাগল হয়ে গেলে না কি?

—বন্দী সভয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

—তোমার কথা শুনে হাসছি। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বুঝি এই কাজ করছে এখানে?

হ্যাঁ। অনেক দিন ধরে ওরা এখানে ঘাঁটি গেড়েছে। মহারাজ শশাঙ্কের এরা বিরোধী।—বন্দী বলে।

—কেন?

—মহারাজ শশাঙ্ক হিন্দু বলে।

বিষেণদেব ভাবতে লাগলো। এই বনের মধ্যে ঘাঁটি তৈরি করেছে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। এখান থেকেই মহারাজার বিরুদ্ধে কাজ করছে। ওদিকে প্রতিষ্ঠান-দুর্গে বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্ধনের সেনারা ওৎ পেতে রয়েছে। সুযোগ পেলেই মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্য সীমানা পার হবে। এসব বৌদ্ধঘাঁটি নিশ্চয় সম্রাট হর্ষবর্ধনের আদেশেই তৈরী হয়েছে। গোপনে এরা সব খবর পাঠাচ্ছে কান্যকুব্জে! তাই এরা রাজধানীর বার্তা জানতে চাইছিল।

—তা অন্ধকার ঘরে কি খোঁজ করছিলে হে?

—দেখছিলাম, দেওয়ালে কোন গর্ত আছে কি-না!

—কেন? পালাবার চেষ্টা করছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ। জানলে কি করে? হাত গুণতে পার বুঝি?

আরে! আমিও তো পালাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারি নি। একা একা অত উঁচুতে ওঠা সম্ভব নয়।—লোকটা থামলো।

বিষেণদেব উপরের ফাঁকটার দিকে তাকাল।

ওখান দিয়ে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে। বেশ বড় ফাঁক। খুব সহজে একজন লোক ওখান দিয়ে বার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অত উঁচুতে উঠতে হবে তো। উঠবার তো কোন উপায় দেখছে না বিষেণদেব।

তুমি পালাতে চাইছ, তাই না?—বন্দী শুধাল।

বিষেণদেব মুখে কিছু বললো না। শুধু ঘাড় নাড়লো।

—পালিয়ে তুমি কোথায় যাবে বলো তো?

—রাজধানী কর্ণসুবর্ণে!

—ওঃ তুমি মহারাজার সৈনিক বুঝি?

—হ্যাঁ। মণ্ডলা দুর্গ থেকে আসছি। আগামী কাল রাজধানী আমাকে পৌঁছতেই হবে।

বেশ। আমি তোমাকে পালাতে সাহায্য করবো। কিন্তু শপথ কর যে, পালাতে পারলে তুমি আমার একটা কাজ করবে?—ফিস ফিস করে বললো লোকটি। বলতে বলতে উঠে বসলো। ওর কণ্ঠে উত্তেজনা

—বেশ! শপথ করছি। তুমি যা বলবে তা শুনবো।

—রূপগঞ্জে আমার দোকান আছে। বাড়ি-ঘর, ছেলে-মেয়ে-বউ সবাই আছে। গঞ্জে গিয়ে যাকেই বলবে অক্রূর শেঠের বাড়ি, সে-ই দেখিয়ে দেবে। আমার ছেলে-মেয়ে-বউকে তুমি মহারাজের কাছে পৌঁছে দিও। আমাকে ভিক্ষুরা এখানে মেরে ফেলবে। তারপর ওরা আমার ছেলে-মেয়ে-বউকে মেরে সম্পত্তি কেড়ে নেবে। তুমি ওদের বাঁচিও ভাই।

—শুধু ওদের কেন? তোমাকেও এখান থেকে বাঁচাবো। রাজধানীতে হাজির হতে পারলে মহা-বলাধ্যক্ষকে সব কথা বলবো। উনি নিশ্চয় বিহার থেকে তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

—তত দিন এরা আমাকে বাঁচতে দেবে না, ভাই!

উপরের ফাঁকটা আবার অন্ধকারে ঢেকে গেছে। চাঁদের আলো আর চোখে পড়ছে না। হয় তো মেঘে আচ্ছন্ন হয়েছে আকাশ—ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদের মুখ। গভীর কালো আঁধার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

তুমি আমার কাঁধে পা দিয়ে উঠে দাঁড়াও। উপরের গর্তের কাছ বরাবর তোমার হাত পৌঁছে যাবে।—বন্দী সনাতন বললো মৃদু কণ্ঠে।

তুমি অসুস্থ। তোমাকে আর কষ্ট দেব না, ভাই। —কাতর কণ্ঠে বললো বিষেণদেব। একজন অসুস্থ মানুষের কাঁধে উঠে সে পালাতে চায় না। তার চেয়ে কাল ভোরে গরম তেলের কড়াইতে সে জীবন বিসর্জন দেবে।

আমার নিজের ছেলে-মেয়েদের বাঁচাবার জন্যে তোমাকে পালাতে সাহায্য করছি। তুমি এস। আমার কাঁধে উঠে দাঁড়াও। 'না' বলো না সৈনিক।—বন্দী সনাতন উঠে দাঁড়ালো। আন্দাজে এগিয়ে গেল দেওয়ালের ধারে।

বিষেণদেব মন থেকে সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেললো। হ্যাঁ, ঠিক বলেছে সনাতন। তাকে বাঁচতে হবে। কারণ সে পালাতে পারলে আরও অনেকগুলো মানুষ বাঁচবে। রাজ-বিরোধী এই বৌদ্ধ সঙ্ঘও ধ্বংস হবে। সে সৈনিক—জীবন দিতে কুণ্ঠিত নয়। আবার প্রতিহিংসা নিতেও ইতস্ততঃ করে না। আর এই প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যই সে পালাবে।

[ক্রমশঃ]

স্বাধীনতার স্বপ্ন

হত্যা করিনি, শত্রু বধ করেছি

সাগ্নিক

লণ্ডন। ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটের বিরাট হল ঘর। সেখানে এক সভার আয়োজন হয়েছে। ভারত-সচিব লর্ড মর্লি, ভারতের বড়লাট ও বঙ্গভঙ্গের স্রষ্টা লর্ড কার্জন, স্যার উইলিয়াম কার্জন উইলি প্রভৃতি রাজপুরুষেরা এসেছেন গল্পগুজব খানাপিনা করতে।

কিছু ভারতীয় ছাত্রও সেখানে উপস্থিত। তারা বিলাতে পড়াশোনা করতে এসেছে। তাদের বেশির ভাগই ধনী রাজভক্ত ভারতীয়দের পুত্র। এই রকম এক ছাত্র মদনলাল ধিংরাকে দেখে স্যার উইলি কথা বলার জন্য এগিয়ে এলেন। ছাত্রটির পিতা তাঁর পরিচিত। বন্ধু-পুত্র এই রকম সভায় যোগ দেওয়ায় স্যার উইলি একটু খুশীই হয়েছেন।

বর্তমানে ভারতবর্ষের ছাত্রদের মতিগতি মোটেই সুবিধার নয়। কিছু বাঙালী শিক্ষিত যুবক সারা দেশের ছেলেদের মাথা খেয়ে দিচ্ছে রাজদ্রোহকর কথা শুনিয়ে। পাঞ্জাবী ও মারাঠী যুবকদের উপর তারা রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেছে। বাঙালীদের অবশ্য সায়েস্তা করার ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের দেশটাকে টুকরো-টুকরো করে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, খানিকটা গেছে বিহারে, খানিকটা আসামে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া বিপ্লববাদী কিছু যুবককে ফাঁসি, কিছুকে দ্বীপান্তরে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে।

যাই হোক, প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের রাজভক্তি বৃদ্ধির জন্য এইরকম সভায় মারাঠী ছাত্র ধিংরার উপস্থিতি লর্ড মর্লির পার্শ্বচর স্যার উইলির খুব ভালই লাগল। তিনি তাকে আরও কিছু সদুপদেশ দিতে ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হলো না। ধিংরা তাঁকে চিরতরে নীরব করে দিলেন।

জনপূর্ণ সভার মাঝখানে ধিংরা হঠাৎ কোটের পকেট থেকে এক রিভলবার বের করে স্যার ডব্লু. সি. উইলিকে গুলি করলেন। উইলি ঝড়ে-ভেঙে-পড়া গাছের মতোই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। নিমেষের মধ্যে সভাগৃহে শুরু হলো দারুণ বিশৃঙ্খলা আর হট্টগোল। প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারে পালাবার জন্য ব্যস্ত। ইংরাজদের এই ভয়কাতুরে অবস্থা দেখে ধিংরা হেসে হাতের রিভলবার দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁকে নিরস্ত্র দেখে পলায়মান বীরপুঙ্গবদের সাহস ফিরে এল। কয়েকজন দৌড়ে এসে তাঁর হাত দুটো বেঁধে ফেলার চেষ্টা করল।

আরে, আরে! অত ধাক্কাধাক্কি করবেন না, আমার চশমাটা পড়ে যাবে। আগে চশমাটা ঠিক করে পরে নিতে দিন, তারপর যত পারুন হাত বাঁধুন!—নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ কণ্ঠে ধিংরা গ্রেপ্তারকারীদের বললেন।

এই রকম হঠাৎ হত্যা করার জন্য কেউ কেউ ধিংরাকে ভাবল বিকৃত মস্তিষ্ক। জেলের ডাক্তাররা কিন্তু পরীক্ষা করে বললেন যে, তাঁর নার্ভ ও হার্ট স্বাভাবিক, কোন উত্তেজনা নেই—ধীর-স্থির শান্ত (sane and sober)।

তাঁকে প্রশ্ন করা হলো—ঠাণ্ডা মাথায় এ রকম হত্যা (cold-blooded murder) তুমি কি করে করলে?

জবাব এল—হত্যা? আমি তো হত্যা করিনি, শত্রু বধ করেছি। বিজিত ও বিজেতা দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ চলছে, বেয়নেট বাগিয়ে ধরেছে দু পক্ষই। আমি জাতীয়তার সৈনিক, তাই বিজেতাকে মেরেছি।

১৯০৯ সালের ১লা জুলাই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য লণ্ডনের ওল্ড বেইলি বিচারালয়ে মদনলাল ধিংরার বিচার শুরু হলো। হাকিমের কাছে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় এক বিবৃতি দিলেন ঃ

ভারতীয় যুবকদের অমানুষিকভাবে নির্বাসন ও ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যৎসামান্য প্রতিবাদ জানাবার জন্যই আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ইংরাজের রক্তপাতের চেষ্টা করেছি।

ধিংরা কোর্টে আরও বলেন—ভারতবর্ষে আমার

দেশের মেয়েদের সম্ভ্রম-ইজ্জতকে প্রতিদিন ধূলোয় লুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করছে। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতের অপরিমিত অর্থ ও সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে। আর এই-সব অনাচার, অত্যাচার ঘটছে চোখের ওপর।

দেশপ্রেমিক ধিংরা ইংরাজ শাসকদের স্তম্ভিত করে দিয়ে বললেন যে, তিনি ইংরাজদের কাছ থেকে কোন করুণা আশা করেন না। কারণ তিনি এই বিচারপতি ও তাঁর আদালতকেই স্বীকার করছেন না। তিনি চান যে, ইংরাজরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করুক। তাহলে তাঁর দেশবাসীর প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা হবে আরও তীব্র ও আন্তরিক। তিনি এই বিবৃতি দিচ্ছেন বহির্জগতের নাগরিকদের জন্য, বিশেষ করে আমেরিকার সহানুভূতিশীল অধিবাসীদের কাছে তাঁর কার্যের যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা বোঝাতে।

ধিংরা এই মামলায় তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকিল নিযুক্ত হতে দিলেন না। ইংরাজের বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে ধিংরা তো মহাখুশী! তিনি আবার সকলকে চমকে দিয়ে ইংরাজ বিচারককে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—দেশের জন্য শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে পারায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করি!

আদালতে ধিংরার বিবৃতি ইংরাজ সরকার চেপে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সরকারী সতর্কতা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের 'ডেইলী নিউজ'-এ ১৯০৯ সালের সতেরোই আগস্ট এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়। আর সংগে সংগে দেশ-বিদেশে হৈচৈ-শোরগোল শুরু হয়ে যায়।

আইরিশ কাগজ লিখল ঃ ধিংরা নিজের দেশের জন্য জীবন আহুতি দিয়েছেন, আয়ারল্যাণ্ড সেজন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে!

আমেরিকার সংবাদপত্রে বড় হেডিং দিয়ে লেখা হলো ঃ ধিংরার চেপে-রাখা বিবৃতি! এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা! অস্বস্তিকর অবস্থায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট!

ভারতবর্ষেও ধিংরার বিবৃতি চেপে রাখার চেষ্টা হয়। বিপ্লবী সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু সত্যানন্দ পরম-হংস পরিব্রাজক—যিনি বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতেন—তিনি কোন এক স্যার উপাধিধারী বিখ্যাত ব্যক্তির লাইব্রেরী থেকে লয়েড জর্জের 'মাই ডায়রী' পুস্তকের কপি গোপনে সংগ্রহ করে বাংলার এক সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দিলেন এবং সারা দেশে প্রচার করে দিলেন বিবৃতিটি।

দেশ-বিদেশে এইসব হৈচৈ-এর ফলে ইংরাজ সরকার দেশপ্রেমিক ধিংরার চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের জন্য তৎপর হয়ে উঠল। তারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হলো যে, ধিংরা বিকৃতবুদ্ধির পথভ্রষ্ট যুবক। রাজভক্ত ভারতীয়দের দিয়ে তারা লণ্ডনের কাক্সটন হলে এক প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করাল ধিংরার হঠকারী কার্য-কলাপের নিন্দা করার জন্য। ধিংরার পিতা ধিংরাকে বংশের কুলাঙ্গার বলে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। ধিংরার এক ভাই কুন্দনলাল বিলাতের সভায় উপস্থিত হয়ে ভাইয়ের কার্যকলাপের নিন্দা করল।

এই সময় মারাঠী বিপ্লবী সাভারকর বিলাতে ব্যারিস্টার হতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রবাসী ছাত্রদের বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করছিলেন। তিনি সভায় এই নিন্দাসূচক প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। আর তার ফলে ক্ষিপ্ত ইংরাজরা তাঁকে মারাত্মক প্রহার করে। তার পরেও প্রবাসী ছাত্র ও বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর ভাই) বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকায় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ-লিপি প্রকাশ করেন।

রাজভক্তরা ধিংরার নিন্দায় সোচ্চার হলেও দেশের মানুষের মনের মন্দিরে কিন্তু ধিংরা স্থান পেলেন। কারণ বঙ্গভঙ্গের প্রতিশোধ বাংলা বিপ্লবীদের হয়ে তিনি গ্রহণ করেছেন। লর্ড কার্জনকে না পেয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন স্যার কার্জন উইলিকে।

বার্ড স্ট্রীট কোর্টে ধিংরার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। পেন্টনভিল কারগারে তাঁর রাজভক্ত দু ভাই কুন্দনলাল ও ভজনলাল সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি ঘৃণায় ও ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে নেন।

ফাঁসির দিন সকালে নিয়মমাফিক সেলে এসে এক পাদ্রী তাঁকে প্রার্থনা করতে বলায় ধিংরা বললেন—আমি পাপ করিনি, পুণ্য করেছি। আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি, হিন্দু থেকেই মরব! আপনাকে কোন দরকার নেই।

অবিচলিত নির্ভীক পদক্ষেপে জেল কর্তৃপক্ষকে অবাক করে দিয়ে তিনি ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন।

ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শা বলেছিলেন—

"গাজিয়োঁ খুনে বু রহেগী যব তক ইসান কি
খাস লণ্ডন তক্ চলে তেগ হিন্দুস্থান কি।"

(বীরদের শোণিতে যত দিন মর্যাদার সৌরভ থাকবে, তত দিন হিন্দুস্থানের অসি লণ্ডনের হৃদয়ে বিঁধবে।

এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য করেছিলেন মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম শহীদ মদনলাল ধিংরা!

জল-জঙ্গলের খেলাধুলো

★

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

শুধু খেয়ে আর শুয়ে কেউ দিন কাটাতে পারে না, তাকে অন্য কিছু করতেই হবে। সে মানুষ হোক, গোরু-ঘোড়া-ভেড়া বা বাঘ-ভালুক-সিংহ হোক আর কীট-পতঙ্গ-পাখীই হোক—অন্য কিছু না করে সে পারবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই অন্যটি কি? ধরা যাক মানুষের কথা। মানুষ কাজকর্ম করে, খায়-দায়, ঘুমায়, লেখা-পড়া করে, গান-বাজনা-অভিনয় করে, শোনে ও দেখে, পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, গল্প-গুজব করে, দেশ-দেশান্তরে বেড়াতে যায়, ঝগড়া-বিবাদ, খেলাধুলা প্রভৃতি করে। এমনি করেই সে জীবন কাটায়।

পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গরা এত সব না করলেও অনেক কিছু করে। প্রাণ থাকলে কেউ এসব না করে পারে?

অন্য কথা ছেড়ে এবারের মত খেলাধুলোর কথাই বলা যাক। সব বয়সের সব মানুষের মধ্যেই দেখা যায় খেলাধুলোর অনুষ্ঠান। প্রভেদ শুধু এই, কেউ খেলা করে আনন্দ পায়, কেউ বা খেলা দেখে আনন্দ পায়।

পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গদের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। বাঘ হয়তো নিজে খেলা করে না, কিন্তু বাচ্চাদের খেলায়, তাদের খেলা দেখে।

বাঘ, সিংহ, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীরা বাচ্চাদের কাছে নিয়ে শুয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে তাদের খেলা দেয়। কখনো কখনো বাচ্চারা মায়ের বুকে পিঠে উঠে নিজেদের মধ্যে গড়াগড়ি, হুটোপুটি করে খেলা করে।

কুকুর, ভালুক, শুয়োর, শেয়াল, ছাগল প্রভৃতির বাচ্চারাও মায়ের কাছে থেকে বাঘ, সিংহ প্রভৃতির বাচ্চার মত খেলা করে। গোরুর বাছুর মায়ের সঙ্গে চরতে চরতে অকস্মাৎ লেজ তুলে তীর বেগে এক ছুট ছুটে আসে। হাতিরা অনেক সময় বাচ্চাদের শুঁড় নিজের শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে তাদের খেলা দেয়। বানরদের মধ্যেও দেখা যায় বাচ্চাদের নিয়ে এমনি নানা ধরনের ক্রীড়াকৌতুকের অনুষ্ঠান।

খেলাধুলো কেবল যে বাচ্চাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। বড়রাও নানা ধরনের খেলা করে থাকে। গৃহ-পালিত সিংওলা গোরু, ছাগল, হরিণ, চিতল, বাইসন, কৃষ্ণসার, বারসিঙ্গা, গৌর (বন্য গোরু) প্রভৃতির মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, একে অপরের সিং-এ সিং লাগিয়ে ঠেলাঠেলি করে শক্তি পরীক্ষার খেলা করছে। কুকুরদের মধ্যে মনের আনন্দে ছোটাছুটি, একের অপরকে তাড়ান, কৃত্রিম কামড়াকামড়ি প্রভৃতি করতে হামেশা দেখা যায়। ওটাই ওদের খেলা।

হাতিদের চলতে চলতে শুঁড়ে করে ধুলো নিয়ে ছড়ান এক মজার খেলা। আবার এরা যখন দল বেঁধে জলে নামে, তখনকার এদের জলক্রীড়া সত্যিই দেখার মত জিনিস। জলে নেমে মহানন্দে আমাদের ছেলেদের মত সাঁতার কেটে, জল ছড়িয়ে শুঁড়ে করে জল তুলে নিজের এবং অন্যের গায়ে-মাথায় ফোয়ারার মত ছিঁটিয়ে এরা কত রকমের খেলা যে করে, তার শেষ নেই।

অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারুদের খেলাও কম মজাদার নয়। দুটি যুবা ক্যাঙারুর মুখোমুখি দেখা হলে এক-জন আর একজনকে থাবা দিয়ে আলতো ঘুষি মেরে খেলা শুরু করে। কিছুক্ষণ বক্সিং চালিয়ে দুজনেই একটু বিশ্রাম নেয়, তারপর আবার শুরু করে খেলা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় দুই বক্সার বুঝি বক্সিং লড়ছে।

আবার কখনো কখনো ওরা শুরু করে দৌড়—এক-জন চেষ্টা করে অন্যজনকে ধরতে। অন্যজন এদিকে ওদিকে ছোটে, কিছুতেই ধরা দেবে না। কখনো বা দেখা যায়, ওরা পেছনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই ফন্টে! দাদু বললে, ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনতে। ওঁর হাঁপানীর টান না কি বেড়েছে।
চল্ তাহলে।
এই তো ডাক্তারবাবু! আমরা আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। দাদু আপনাকে একবার দেখতে যেতে বলেছেন, ওঁর হাঁপানী একটু নাকি বেড়েছে।
আরে আমি তো তোদের বাড়িতেই যাচ্ছি।
শোন্ এক কাণ্ড হয়েছে। তোদের দাদু একটা লটারির টিকিট কিনেছিল। আজ কাগজে দেখলাম ঐ টিকিট ফার্স্ট প্রাইজ দু লক্ষ টাকা পেয়েছে। তাই তোদের দাদুকে খবরটা দিতে যাচ্ছি। একে হাঁপানীর রুগী, তাই হঠাৎ শুনলে হার্ট ফেল করতে পারে। তাই আমি একটু কায়দা করে জানাবো।
ঘরে
দাদু! ডাক্তারবাবু এসেছেন।
কেমন আছেন গড়গড়ি মশাই?
ভালো না।
টানটা আজ বেশ একটু বেড়েছে।
বেশ একটু ঘুরিয়ে বলতে হবে দেখছি।
ওর জন্যে কোন চিন্তা নেই।

আচ্ছা গড়গড়ি মশাই! আপনি যদি হঠাৎ দশ হাজার টাকা পেয়ে যান তাহলে কি করবেন?
ভালো করে চিকিচ্ছে টিকিচ্ছে করাবো।
যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা পান তাহলে ?
কি যে বলেন ডাক্তারবাবু! তবে পাই যদি তাহলে মনের সুখে তীর্থে-টীর্থে ঘুরে বেড়াই।
যদি দু লক্ষ টাকা পান ?
নন্টে রে, দাদুর হার্ট বোধ হয় ফেল করলো!
তাহলে আদ্ধেক আপনাকে দিয়ে দেবো।
আদ্ধেক আমাকে দিয়ে দেবেন! তা-তার মানে এক লক্ষ টা-টাকা আমার — ইক্!
!
?
ডাক্তার অজ্ঞান হয়ে গেছে। শিগগির আর একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়।
তাজ্জব মাইরি! হেঁপো রুগী দাদু ঠিক টাইট হয়ে বসে রইল, আর টাকা পাবে শুনে উল্টে ডাক্তারবাবুই ফট্।
কি গেরো বল্ দেখি। ডাক্তারের জন্যে এখন আবার ডাক্তার ডাকতে হবে।
যা বলেছিস।

দাঁড়িয়ে ভাঁড়ের মত অংগভংগীর খেলা করছে।

বানরদের মধ্যেও বাঁদরামি আর ক্রীড়াকৌতুকের অন্ত নেই। ছুটোছুটি হুটোপুটি ছাড়াও অনেক সময় দেখা যায়—একটা বানর গাছের ডালে বসে আছে। তার ঝুলে-পড়া লেজটা ধরে আর একজন দোল খাচ্ছে। সুন্দরবনের দিকে দেখা যায়, বানররা চরে-খাওয়া হরিণের পিঠে চেপে মহাসুখে বসে আছে। হরিণরা বিনা প্রতিবাদে ঘুরছে এদের পিঠে নিয়ে।

মেরু প্রদেশের শ্বেতভল্লুক মেরু প্রদেশের বরফ-পাহাড়ের উপরকার বাসিন্দা হলেও খেলার স্থল এদের মেরুসাগর। এদের পায়ের আঙুলগুলো হাঁসেদের মত জোড়া। তাই সাঁতার কাটায় এরা ভারি পটু। খুশি মত সত্তর-আশি মাইল সাঁতরে চলে যেতে পারে। ইচ্ছে মত যায়ও। আর এই সাঁতার কাটার সময় কত রকমের মজাই না করে! কখনো কখনো জলের উপর চিৎ হয়ে ভাসে। এমনি ভাসতে ভাসতে এক-এক সময় সামনের থাবা দুখানা দিয়ে পেছনের পা দুখানা চেপে ধরে কুমোরের চাকের মত ঘুরপাক খেতে থাকে। দূর থেকে মনে হয় বুঝি একটা তেলের পিপে ঘুরছে।

অস্ট্রেলিয়ার প্ল্যাটিপাসরাও এমনি জলক্রীড়ার ভক্ত। প্রায়ই এদের দেখা যায়, মাথাটা জলের উপর রেখে সারা দেহ জলে ডুবিয়ে বোতলের মত ভাসছে। কখনো ডুবছে, কখনো সাঁতরাচ্ছে। জল এদের স্ফূর্তি জাগায়। জাগায় খেলার টান।

পেলিকান আকারে, আকৃতিতে এবং আচরণে বিচিত্র পাখী। নীচের চোয়ালের থলি, মস্ত ঠোঁট, গোঙানি, কর্কশ ঘোঁৎ-ঘোঁতানি, চড়া সুরের ইয়াপ-ইয়াপ শব্দ এবং ঠোঁটটা উঁচু করে মানুষের হাততালির মত আও-য়াজ করা, চোয়ালের থলিটা জেলেদের জালের মত করে মাছ ছেঁকে তোলা প্রভৃতি সত্যি বৈচিত্র্যে ভরা। খেলাও এদের সমান বৈচিত্র্যময়।

বেলা আড়াইটে-তিনটে বাজলেই এরা দল আর বাসা ছেড়ে একে একে উঁচুতে উঠে আপন মনে পাক খায়, মোচড় খায়, উল্টে যায়, ডিগবাজি খায়, গড়িয়ে যায়, ঘুড়ির গোঁৎ খাওয়ার মত গোঁৎ খায়, এমনি আরো কত খেলা যে করে তার সীমা সংখ্যা নেই। লক্কা প্রভৃতি পায়রাও সকালে বিকেলে দল বেঁধে উড়তে উড়তে অমনিতর নানা খেলার কসরৎ দেখায়।

বাসা বোনার কাজ শেষ হলে বাবুই পাখীরাও এমনি আনন্দ ক্রীড়ায় মাতে। ভাবখানা এই যেন, আগে কাজ তারপর আনন্দ আর খেলা। সেই যে প্রবাদ আছে ঃ কাজ সেরে বসি। শত্রু মেরে হাসি। এরাও তাই করে। বাসা তৈরির কাজ শেষ হলে এরা যে কি করে আনন্দ করবে, তা ভেবে শেষ করতে পারে না। উড়ে উড়ে দলে দলে ডিগবাজী খায়, মহা উৎসাহে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি শুরু করে আর চড়ুইদের মত কিচিরমিচিরের তো শেষই নেই।

ডল্‌ফিন সাগরের বাসিন্দা। তবে এরা মাছ নয়, স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী প্রাণী। লম্বায় সাত-আট হাত। ওজন সাড়ে তিন মণ, চার মণ। মাথা ছোট, ঠোঁট লম্বা। এরা হাঙর শিকারে ভারি ওস্তাদ।

ডল্‌ফিনরা খুব খেলা ভালবাসে। এদের একটা মজার খেলা হচ্ছে নানা রকম শব্দ অনুকরণ করা। ডুবো জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ, মানুষের উচ্চ হাসির শব্দ, পাখীর শিস্ দেওয়ার মত শব্দ এরা অবিকল নকল করতে পারে।

এক ডল্‌ফিন নিউজিল্যাণ্ডের একটা ছেলের খেলার সাথী ছিল। ছেলেটি তার রবারের বল যতবার জলে ছুড়ে দিত, ঐ ডল্‌ফিন ততবারই তার ঠোঁট দিয়ে আঘাত করে বলটা তার কাছে ফিরিয়ে দিত।

প্রাণীবিজ্ঞানী ডক্টর ওলসন একবার দুটো ডল্‌-ফিনের এক মজার খেলা দেখেন। একটা ডল্‌ফিন লাল রং-এর এক স্যাপার মাছের লেজ তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে পেছনের দিকে সাঁতরে আসছে। সাঁতরে আসতে আসতে মাঝে মাঝে তাকে ছেড়ে দিচ্ছে—তারপর আবার ঠোঁট দিয়ে ধরছে। আর একটা ডল্‌ফিন এক কচ্ছপকে তার ঠোঁটের উপর বসিয়ে নিয়ে সাঁতরে চলেছে পরমানন্দে।

এই সব পশুপাখী, মাছ-ব্যাঙ, কীট-পতংগরা মানুষের মত তাস, পাশা, দাবা, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ভলি, পোলো, হকি, ক্যারাম, লুডো, ষোল-ঘুঁটি, বাঘবন্দী প্রভৃতি খেলা বুদ্ধির জোরে আবিষ্কার করতে পারে নি সত্য, তবে তা বলে নিজেদের একেবারে ক্রীড়াশূন্যও করে নি। যে কাজে ওরা স্ফূর্তি আর মনের আনন্দ পেয়েছে, তাকেই নিয়েছে নিজেদের খেলা হিসেবে। সে খেলা একটা দুটো নয়—অসংখ্য।

মহাকাল রায়

৮ই ডিসেম্বর ঃ

রবিবারের সকাল। দিগন্তবিলীন নীল সমুদ্রের মাঝে যেন ছোট্ট এক বিন্দু—হাওয়াই দ্বীপ। পূব-পশ্চিমের পর্বতমালার উপর সেদিন পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ। পার্ল হারবারের বিরাট নেভাল বেস্ বা নৌঘাঁটির উপর কয়েক খণ্ড ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

সাগর থেকে সদ্য-ওঠা সূর্যের মিষ্টি রোদে দ্বীপটা যেন আলস্যে হাত পা ছড়িয়ে আছে! অলস মন্থর গতিতে বেসামরিক বিমান পাক খেয়ে চলেছে। নিত্যকার মত আকাশে উড়ছে কয়েক ঝাঁক টহলদারী বিমান।

পার্ল হারবার। মার্কিনের প্রশান্ত মহাসাগরের সেরা নৌঘাঁটি। কাতারে কাতারে যুদ্ধজাহাজ স্থির নিশ্চল। চিমনি থেকে ধোঁয়ার ঝলক নেই!

থাকার কারণও নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে ইউরোপ-আফ্রিকায়। এশিয়ার এদিকটায় সব শান্ত। জাপান যুদ্ধে যোগ দেয় নি, আমেরিকার সঙ্গে তার শত্রুতা নেই। এমনি অবস্থায় হঠাৎ সেদিন—

পঁচিশ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে দেখা গেল, একটা বিমানের ঝাঁক এগিয়ে আসছে। সমুদ্রের কপালে সবুজ টিপের মত ঘুমন্ত দ্বীপটির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য বুঝি বম্বার-স্কোয়াড্রনের পাইলটদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে!

হাই-লেভেল বম্বার থেকে ভেসে আসে, কমাণ্ডার ফুচিডার মোর্স সংকেতঃ টু...... টু...... টু......!

সংকেত মত এগিয়ে চলে বম্বারের ঝাঁক!

নিচে প্রকাণ্ড একটা রিলিফ ম্যাপের মত পড়ে আছে দ্বীপটা—নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ। পুলকিত হন কমাণ্ডার ফুচিডা। ঠিক যেমন পরিকল্পনা হয়েছিল, তেমনি চলছে সবই।

বিরাট নেভাল বেস্‌টা থেকে উঠছে না একটাও ফাইটার বিমান বা অ্যান্টি-এয়ারক্রাফটের গোলায় কালো ধোঁয়ার ছত্রাক। অবিশ্বাস্য চকিত আক্রমণের বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে মাথা তুলতে পারবে না শত্রু!

বোমা বর্ষণ শুরু করবার আগে ফুচিডা বেতার-সংকেত পাঠালেন কম্‌বাইন্‌ড্ ফ্লিট হেডকোয়ার্টারে ঃ টোরা...টোরা...টোরা... অর্থাৎ আচমকা আক্রমণের প্ল্যান আমাদের সম্পূর্ণ সফল হয়েছে!

সেদিন পার্ল হারবারের নেভাল বেসে ছিল বিমান মহড়া।

একখানা জাহাজে দাঁড়িয়ে একজন নেভাল অফিসার দেখলেন ঃ ঝাঁক ঝাঁক বিমান আসছে।

কিন্তু এ কী! সত্যি সত্যিই যে ওরা বোমা ফেলল একটা জাহাজে! জাহাজখানা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল ফেটে চৌচির হয়ে! পাইলটের কি মাথা খারাপ হয়েছে? মনে নেই, এটা মহড়া!

আরে, আবার বোমা? আবার...আবার...বোমার পর বোমা পড়ছে জাহাজের পর জাহাজে, বিমানঘাঁটিতে, বড় বড় ম্যানসনে। মুহূর্তে ধোঁয়া আর আগুন বিকট জিভ মেলে আকাশে ছড়িয়ে দিল ধ্বংসের মারণযজ্ঞ!

অ্যাঁ, তাহলে কি জাপরাই আক্রমণ করল!

কয়েক মিনিট পরেই বেতার-ঘোষক কম্পিত কণ্ঠে বারে বারে হেঁকে চলে সারা বিশ্বের উদ্দেশ্যে ঃ এয়ার রেড, পার্ল হারবার। দিস ইজ নো ড্রিল। অর্থাৎ বিমান মহড়া নয়। পার্ল হারবারে আক্রমণ শুরু হয়েছে।

শুধু পার্ল হারবার নয়। সেদিন একই সঙ্গে আক্রান্ত হয়েছিল ফিলিপাইন, গুয়াম, হংকং, ওয়েক দ্বীপ, শ্যামদেশ, মালয়ের কোটা বারু থেকে সিঙ্গাপুর।

৮ই ডিসেম্বর ১৯৪১! প্রাচ্যের উদিত সূর্য জাপান সেদিন তিন পশ্চিমী শক্তি ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসীর বিরুদ্ধে প্রায় আধখানা পৃথিবী জুড়ে আক্রমণ শুরু করেছিল।

উদ্দেশ্যটা অবশ্য শুধুই পশ্চিমী সাম্রাজ্য-শক্তি উচ্ছেদ করা নয়, ঐ সঙ্গে নিজেদের জাতীয় জীবনদর্শন সফল করা—সারা দুনিয়াকে নিজের কব্জায় আনা শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে।

উদ্দেশ্যটা যদিও সফল হয়নি, তবু এই আক্রমণ সেদিন এমন একটা শক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, যা কয়েক বছরের মধ্যেই সারা দুনিয়ার ম্যাপের রাজনৈতিক রং পালটে দিল।

এর ফলে যেমন ঢাকা পড়ল উদিত সূর্যের দীপ্তি, তেমনি অস্ত গেল এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-সূর্য!

৯ই ডিসেম্বর ঃ

'ফুল আর চাঁদের দিকে চেয়ে কবিতা লিখে আর গজদন্তের মিনারে বাস করলেই চলবে না কবিকে। লড়তে হবে তাকে নিজের বিশ্বাসকে রূপায়িত করতে, মনুষ্যত্বের দীপকে জ্বালিয়ে রাখতে......'

মনে হবে, এ বুঝি একালের কোনও সংগ্রামী কবির কথা। কিন্তু না, কথাগুলো বলেছিলেন সাড়ে তিন শ বছর আগে ইংরাজ কবি মিলটন। নিজের জীবন দিয়ে সার্থক করে গেছেন তিনি এ জীবনবেদ।

ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনায় টান মিলটনের। রাত বারোটা পর্যন্ত পড়াশুনা করেন বারো বছর বয়স থেকেই। কবিতা লেখেন। ল্যাটিন কবিতা লিখে পুরস্কার পান। স্কুলে নামডাক হয়।

বাপ নিজে গানবাজনা ভালবাসেন। ছেলে কাব্য নিয়ে জীবন কাটালে তাঁর আপত্তি নেই, বরং খুশীই।

সেন্টপল স্কুল থেকে মিলটন এলেন ক্রাইস্ট কলেজে। এখানে কাটল সাত বছর। মেয়েদের মত কমনীয় সুন্দর তাঁর চেহারা, নান বা সন্ন্যাসিনীদের মত ধর্মে ও নীতিশাস্ত্রে নিষ্ঠা। ক্লাসের ছেলেরা তাই ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল, 'খৃষ্টের সন্ন্যাসিনী' (লেডি অব দি ক্রাইস্ট)! কলেজে থাকতেই তিনি লিখলেন মৌলিক কবিতা কয়েকটি।

কেম্ব্রিজ থেকে ফিরে ছয় বছর মিলটন কাটালেন গাঁয়ের বাড়ী হোর্টনে। এখানে প্রচুর পড়াশুনা করলেন—ভবিষ্যতের কবি-সত্তাকে তৈরি করতে।

ইতালী তখনকার দিনে কবি-সাহিত্যিকদের তীর্থ। ১৬৩৮ সালে মিলটন প্রথম বের হলেন ইউরোপ-পরিক্রমায়। এলেন ইতালীতে। দেখা করলেন আধুনিক বিজ্ঞানের জনক গ্যালিলিওর সঙ্গে।

এখানেই তাঁর মনে জাগল, হোমার ও ভার্জিলের অনুকরণে মহাকাব্য লিখবার ইচ্ছা। ঠিক করলেন, ইংলণ্ডের জাতীয় বীর রাজা আর্থারের কাহিনী নিয়েই লিখবেন এই মহাকাব্য।

এমন সময় ইংলণ্ডের রাজনীতিতে এল বিপ্লব। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, চার্চের বিরুদ্ধে দেখা দিল বিদ্রোহ। রেনেসার উদারনীতি ও মানবতাবোধে সিঞ্চিত মিলটনের মন সাড়া দিল এ জন-জাগরণে।

ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে। কুড়ি বছর ধরে চলল এ জীবন। সৌন্দর্য-সৃষ্টির কাজ দূরে সরিয়ে রেখে এ সময় ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ মহাকবিকে দেখা গেল, তীক্ষ্ণ শ্লেষ, ক্ষুরধার যুক্তির অনবদ্য গদ্যে প্রতিপক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করতে।

প্রথম জেমসের সিংহাসন-চ্যুতির পর যে প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হল, তার ল্যাটিন সেক্রেটারীর পদ পেলেন মিলটন।

রাজতন্ত্র ফিরে আসতে নতুন শাসনতন্ত্রের রোষ পড়ল মিলটনের উপর। পালাতে হল তাঁকে। শেষে ধরা পড়ে আটক। তারপর ছাড়া পেলেন কিছুদিন পরে। লেখক হিসাবে তখন তাঁর খ্যাতি দেশজোড়া।

এই সময় দেখা দিল আর এক বিপত্তি। দৃষ্টিশক্তি তাঁর প্রথম থেকেই ছিল ক্ষীণ। ১৬৬৩ সালে সম্পূর্ণ অন্ধ হলেন তিনি। রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য, সরকারী কাজের চাপ থেকে কবি এবার মুক্ত। তত দিনে পরিপূর্ণ প্রস্তুত তিনি মহাকাব্য রচনার জন্য।

কিন্তু কি হবে মহাকাব্যের বিষয়বস্তু? রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কুড়ি বছর যিনি সংগ্রাম করলেন, তিনি রাজতন্ত্রেরই প্রতিভূ আর এক রাজা আর্থারের জীবন নিয়ে মহাকাব্য লিখতে পারেন কি করে?

কবি তাই লিখলেন মানুষের আদিম পাপ আর তা থেকে উত্তরণের বলিষ্ঠ অমর মহাকাব্য 'স্বর্গ থেকে বিদায়' (Paradise Lost) ও 'স্বর্গ পুনরুদ্ধার' (Paradise Regained)। সেই সঙ্গে তাঁর আর এক সাহিত্য কীর্তি হল 'স্যামসনের তীব্র যন্ত্রণা' (Samson Agonistes)।

এই তিনখানি মহাকাব্য যেন বিধৃত করেছে সংগ্রামী

দীপ্তচরিত্র মিলটনের জীবন দর্শন!

পরপর তিনটি বিয়ে করেছিলেন মিলটন। শেষ স্ত্রী এলিজাবেথ মিনশুল কবি ১৬৭৪ সালের ৮ই নভেম্বর মারা যাবার পরও বেঁচে ছিলেন।

শেকসপীয়রের পর ইংরাজী সাহিত্যের সেরা কবি জন মিলটনের জন্ম হয় ১৬০৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর।

২৫শে ডিসেম্বর ঃ

স্বপ্নাদেশ—দেবদূতের বাণী! জেরুজালেমের তিনজন মেষপালক হতচকিত, বিস্মিত! সত্যিই কি প্রভু আসছেন?

দেবদূত স্বপ্নে বলেছেন, দুনিয়ার পাপীতাপীকে উদ্ধার করতে প্রভু এসেছেন দীনের ঘরে, বেথেলহেমের আস্তাবলে। তোমরা যাও, তাঁকে অর্চনা কর।

তিনজন তাই উপহার নিয়ে চলেছেন জেরুজালেম থেকে বেথেলহেমে।

রাজার আদেশে সবাইকে সেদিন আসতে হয়েছে বেথেলহেমে। ইহুদী ছুতার জোসেফ ও তাঁর স্ত্রী মেরীকেও। ভীড়ে ভর্তি শহরে তাঁদের ঠাঁই মেলেনি। করুণা করে সরাইখানার এক মালিক আস্তাবলে থাকতে দিয়েছে। সেখানেই জন্ম হল এক দিব্য শিশুর।

ধূপ, দীপ আর উপঢৌকনে তাঁকে স্বাগত জানালেন জেরুজালেমের তিন স্বপ্নদ্রষ্টা।

বেথেলহেম থেকে নাজারেথে ফিরে এলেন জোসেফ ও মেরী। ছুতারের কাজ শিখতে লাগলেন বালক যিশু। কিন্তু ছুতারের কাজের চেয়ে ধর্মের দিকে তাঁর বেশী আকর্ষণ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন তিনি। বলেন মানুষকে ভালবাসতে, ক্ষমা করতে, করুণা করতে আর স্বার্থত্যাগ করতে পরের জন্য।

দেশ তখন অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ঈশ্বরের বদলে মানুষের মনে শয়তানের রাজত্ব—স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতার হানাহানি।

বেদনায় ভরা করুণাঘন যিশুর মন। সবাইকে শোনান তিনি পরমপিতা পরমেশ্বরের অসীম করুণা ও ক্ষমার বাণী। তাঁর পায়ে সব সমর্পণের আহ্বান জানান তিনি সকলকে।

দেখতে দেখতে ঈশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ মহাপুরুষের ভক্ত জুটে যায় অনেক।

শহরের পথে সেদিন সবাই মিলে একটি স্ত্রীলোককে প্রহার করছে। যিশু বাধা দিতে ছুটে এলেন। প্রহারকারীরা বললে, ও পাপী! তাই প্রহারই ওর যোগ্য শাস্তি। এই তো ঈশ্বরের বিধান!

করুণাময় যিশু বললেন, নিশ্চয়ই, শাস্তি ওর অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু সে শাস্তি দিতে পারে কে? যারা পাপ করেনি, তারাই ত! তোমরা যারা ওকে মারছ, তারা কি কখনও পাপ করনি ঈশ্বরের কাছে?

সত্যিই ত! এ কথা কে বলতে পারে? প্রহারকারীরা সরে দাঁড়াল। পরিত্রাণ পেয়ে হতভাগিনী নারী প্রাণভরে আশীর্বাদ করে যিশু খৃীষ্টকে।

গ্রামে ও শহরে প্রচার করে চলেন যিশু। করুণার অবতার মহাপুরুষের সেবা, প্রেম, ক্ষমা ও অহিংসার বাণী তুমুল সাড়া জাগায় ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে। দলে দলে মানুষ ছুটে আসে তাঁর কাছে।

কিন্তু এই নতুন কথা, নতুন আদর্শ ভাল লাগেনি দেশের রাজার। পুরনো কালের সঙ্গে তাই বাধল নতুন কালের সংঘাত—পুরানো ভাবধারার সঙ্গে নতুন ভাবধারার বিরোধ। ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যেও একদল ক্ষমতাশালী পুরুষ ঘোর বিরোধিতা করতে লাগল যিশুর নবীন ভাবাদর্শের। যিশু ও তাঁর শিষ্যদের উপর চলল অত্যাচার-নিপীড়ন।

এমনি ভাবে চলল কিছুকাল। কিন্তু চিরকাল চলতে পারে না। জনসাধারণের মধ্যে যিশুর প্রচারিত আদর্শের জনপ্রিয়তা দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে দেশের শাসকবর্গ ও রক্ষণশীলের দল। শেষ পর্যন্ত যিশুরই একজন শিষ্য যুডাস ইসকারিয়ট বিশ্বাসঘাতকতা করল। বন্দী হলেন মানবপ্রেমিক পরমপুরুষ।

ধর্মদ্রোহী ও রাজদ্রোহী হিসাবে, মূঢ় মানুষের প্রতিনিধির বিচারে শাস্তি হল তাঁর! ভয়ঙ্কর সে শাস্তি—ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড।

নির্বোধ মানব-সন্তানদের এই মূঢ়তায় তবু কিন্তু ক্রোধ নেই যিশুর মনে। সবার জন্য হৃদয়ভরা ভালবাসা। নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও ক্রুশবিদ্ধ প্রেমের দেবতা প্রার্থনা জানালেন পরমেশ্বরের কাছে—হে ঈশ্বর, এদের তুমি ক্ষমা কর। এরা জানে না, এরা কি করছে।

যিশুর আদর্শের বাণী ছিল সেদিনকার কুসংস্কার, হিংসা, দ্বেষ ও লালসার বিরুদ্ধে নতুন সুন্দর পৃথিবী গড়ার সংগ্রামে লিপ্ত সব মানুষেরই অন্তরের বাণী। তাই সত্যের এই পূজারীকে ক্রুশবিদ্ধ করেও বধ করা যায়নি। তাঁর অর্থাৎ তাঁর আদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল অনির্বাণ ভাস্বর দীপ্তিতে। পরবর্তী কালে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর প্রেমধর্ম বা খৃীষ্টধর্ম।

আজ থেকে ঠিক ১৯৭০ বছর আগে ২৫শে ডিসেম্বর এই মানুষের পৃথিবীতে জন্ম হয়েছিল পরমাশ্চর্য এই প্রেমময় পুরুষের—জীজ্যাস ক্রাইস্ট বা যিশু খ্রীষ্টের!

২৭শে ডিসেম্বর ঃ

জার্মান রাজ দ্বিতীয় রুডল্‌ফের রাজজ্যোতিষী ও প্রাগ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ টিকো ব্রাহে—যেমন রাজকীয় চেহারা, তেমনি চালচলন! ধাতু আর কাঠের তৈরী বিরাট সেক্‌স্‌টান্ট, চোদ্দ ফিট ব্যাসের বিরাট কোয়াড্রাণ্ট, পিতলের তৈরী বিরাট একটা গ্লোবের গায়ে বসানো অসংখ্য ছোট ছোট তারা।

টিকো ব্রাহের মানমন্দিরের মহামূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলি দেখে অবাক হন আর ভাবেন গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য গণিতের অধ্যাপক জোহান কেপলার ঃ কোপারনিকাসের চেয়ে দশগুণ শুদ্ধভাবে হিসাবনিকাশ করা যায় এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে।

যদিও টিকো ব্রাহে কেপলারের মত বিশ্বাস করতেন না কোপারনিকাসের মতবাদে, তবুও তিনি খুশী হয়েছিলেন কেপলারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

গ্রহগণের গতিপথ নিয়ে হিসাবনিকাশ করতেন কেপলার। তাঁর ধারণা হয়েছিল, নির্দিষ্ট একটা গতিপথেই সবগুলি গ্রহ ঘুরছে। পথটা ঠিক কি ধরনের, তা নিয়েই তাঁর সমস্যা। তিনি লক্ষ্য করেছেন, চলতে চলতে কখনও কোন কোন গ্রহের গতি কমে, কখনও বাড়ে। কেন এমন হয়?

প্রশ্নটার জবাব পেতে হলে চাই আরও ভাল মহাকাশ-পর্যবেক্ষণ। তিনি শুনেছেন, মহাখ্যাত রাজজ্যোতির্বিদ টিকো ব্রাহে মূল্যবান যন্ত্রপাতি দিয়ে সারা জীবন ধরে গ্রহগণের গতিপথের অসংখ্য চার্ট এঁকেছেন—নির্ভুল নির্ভরযোগ্য। এগুলি দেখতে পেলে আর সেই সঙ্গে এ ধরনের মানমন্দিরে কাজ করার সুবিধে পেলে, তাঁর স্বপ্ন সফল হতে পারে।

এমন সময় টিকো ব্রাহে কেপলারকে আমন্ত্রণ জানান তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করার জন্য। কেপলার তক্ষুণি সানন্দে গ্রহণ করেন সে আমন্ত্রণ। আর তার ফলেই তাঁর প্রাগে আগমন।

এর পর শুরু হয় কেপলারের মহাকাশ-পর্যবেক্ষণ—কঠিন গবেষণা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। টিকো ব্রাহে কিন্তু কৃপণের মত লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর নিজের চার্ট আর চিত্রগুলি। কেপলারকে সেগুলি দেখানোর ইচ্ছা নেই এতটুকু।

এর কিছুদিন পরেই ব্রাহে মারা গেলেন। কেপলার পেলেন ঐ মানমন্দিরের জ্যোতিষাচার্যের পদ, ব্রাহের সব কাগজপত্রও তাঁর হাতে এল।

এবার কেপলার লেগে যান আসল কাজে। বারে বারে তাঁর চেষ্টা চলে, চলে কঠিন পরিশ্রম। পাতার পর পাতা ভরে ওঠে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরের আঁকজোকে। একটানা ৯০০ পৃষ্ঠার আঁকজোক। তবু গ্রহগণের বৃত্তপথের সঙ্গে খাপ খায় না ব্রাহের পর্যবেক্ষণ।

তবে কি ব্রাহের পর্যবেক্ষণ ভুল? অসম্ভব! আর কোন কিছুর জন্য না হোক, নিখুঁত নির্ভুল পর্যবেক্ষণের জন্য প্রচুর নামডাক তাঁর। তা হলে কি গতিপথ বৃত্তাকার নয়? হাঁসের ডিমের আকারের উপবৃত্ত-পথে চলে গ্রহরা? আবার চলে হিসাবনিকাশ। কিন্তু তবু মেলে কই?

মিলল শেষে। উপবৃত্ত-পথেই চলে গ্রহরা। তবে হাঁসের ডিমের মত অতটা চ্যাপ্টা নয়। বৃত্তকে সামান্য চেপে দিয়ে যে আকার হয়, তেমনি।

অদ্ভুত পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী লোক ছিলেন জ্যোতির্বিদ কেপলার। জার্মানীর এক অতি গরীবের ঘরে ১৫৭১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়। চার বছর বয়সে বসন্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। হাত দুখানাও প্রায় পঙ্গু। তবু এসব দৈহিক বিকলতা তাঁকে দমাতে পারে নি। লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছেলেই ছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পান। পরে পান এখানে অঙ্কের অধ্যাপকের পদ। কিন্তু মাইনে অত্যন্ত কম।

পারিবারিক দুঃখশোক-বিপর্যয়, শারীরিক পঙ্গুত্ব ও আর্থিক অনটনে কেপলার সারা জীবন নিদারুণ কষ্ট পেয়ে গেছেন। প্রাগ মানমন্দিরের অধ্যক্ষের পদ যখন পান, জার্মানরাজের আর্থিক অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। মাইনের সামান্য কটা টাকাও তিনি ঠিক মত পেতেন না। ভাগ্যের এই চরম বিরূপতার বিরুদ্ধে কেপলার একাকী লড়াই করে গেছেন চিরকাল।

আর তারই মধ্যে তিনি অসামান্য সব আবিষ্কার করে যান। বিশেষতঃ আমাদের এই সৌরপরিবারভুক্ত গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে তিনি যে তিনটি সূত্র আবিষ্কার করে গেছেন, আধুনিক মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার মূল্য অপরিসীম। কেপলারের সূত্র নামে তা চিহ্নিত।

১৬৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর এই মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়।

• পরিচালক •

আনন্দ বর্ধন

একরাশ চিন্তার মৃত্যু

দিলীপ রায়

"**বাবু** চারটে পয়সা দেবেন ? আজ তিনদিন ধরে কিছু খাই নি।"—কথাটা বলেই সে আগ্রহের সাথে চেয়ে থাকে ভদ্রলোকটার মুখের দিকে।

কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, "লজ্জা লাগে না, দিব্বি তো গতর দেখছি। খেটে খেতে পারিস না, আবার পয়সা চাওয়া হচ্ছে। যত সব......

মনটা বিষিয়ে উঠল সদ্যবিপত্নীক রমানাথের। রমানাথের অবস্থা এমন ছিল না। সে ছিল দিন-মজুরিতে কলের ফিটার। দু মাস আগে বেল্ট ছিঁড়ে তার ডান হাতটা ভাঙায় চাকরিটা হারাতে হয়। দু মাসে তার সামান্য সঞ্চয়ও শেষ হয়ে যায়। চিন্তায়, অনাহারে ও রোগে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে সে বেরিয়েছে ভিক্ষা করতে। আজ তিনদিন ধরে পেটে একটা দানা পড়ে নি। পেয়েছে কেবল এইসব 'বাবু'দের চোখমুখ খিঁচিয়ে কথা বলা।

রাগে রমানাথের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। ঘেন্না ধরে যায় এই দুনিয়াটার উপর। গদীতে বসে মহাজনরা টাকা লুটছে। আর কষ্ট করে যারা খাটছে, তাদের ভাগ্যে শুধু অনাহার, অপমান এবং বচসা। কিছু বলতে গেলেই 'খেটে খাও, গতর তো বেশ !' তারা শরীরের ওপরটাই কেবল দেখে, কিন্তু ভেতরে যে একটা দানব হাঁ করে বসে আছে সে খবর রাখে না। ওর রগ দুটো দুরন্ত ক্রোধে ফুলে ওঠে মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, যা হয় হোক, একটা কিছু সে করবে—চুরি বা ডাকাতি বা খুন যে করেই হোক তাকে বাঁচাতে হবে।

আর ভাবতে পারে না রমানাথ। মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা এসে জড়ো হয়েছে। তিন দিন ধরে সামান্য ভাতের ফেন খেয়ে দিন কাটিয়েছে। সঙ্গে আবার তিন বছরের রুগ্ন ছেলেটা। ওকেও তো খাওয়াতে হবে, বাঁচাতে হবে। কিন্তু আর বোধহয় সে পারবে না।

দিন দিন রমানাথ নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। এরই মধ্যে ছেলেটা না খেয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে এখন। অজান্তে রমানাথের মনটা কেঁদে ওঠে। ছেলেটা এমন বাপের ছেলে যে বাপ দুমুঠো খাবার জোগাড় করতে পারে না। কিন্তু এর জন্য দায়ী কি রমানাথ ? না, সে তো নিজে না খেয়ে ছেলেটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তবে কি ভগবান দোষী ? দূর ছাই, কি ভাবছে সে ! ওসব ভগবানের দোহাই সে দেয় না। ওসবে তার মোটেই বিশ্বাস নাই।

তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে গোটা সমাজের ছবি। শুধু জালিয়াতি আর চোরাকারবারী। মানুষ সেখানে রমানাথের মতো লোকদের গালি দেয়। তাদের দোষ, তারা খেতে না পেয়ে ভিক্ষা করে। আর এই যে ভদ্রতার মুখোসধারী লোকগুলো নিজের পকেট ভরিয়ে মোটর হাঁকিয়ে স্ফূর্তি করছে, এরা ভগবান ! লোকগুলোর প্রতি ঘেন্নায় রমানাথের মন বিষিয়ে ওঠে। এইসব লোক বা বাবুদেরই সবাই সেলাম ঠুকছে।

হায় রে দুনিয়া!

ভাবতে ভাবতে বুঝি পাগল হয়ে যাবে রমানাথ। তার ভেতরের শয়তানটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে কিছু একটা করবার জন্য। কিন্তু অনেক কষ্টে সে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে। অথচ এমন করেও তো দিন চলবে না!

শেষ পর্যন্ত রমানাথ বেপরোয়া হয়ে যায়। একে নিজের পেটের জ্বালা, তার উপর আবার ছেলেটার কান্না সে আর সহ্য করতে পারছে না। ছেলেটাকে কি করে বোঝাবে তার অক্ষমতার কথা। রমানাথ আর পারছে না! হঠাৎ একটা চিন্তা এসে ওর মাথায় বাসা বাঁধে। চোখটা একবার অজান্তেই ঘুমন্ত ছেলেটার উপর গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো একটা অশান্ত উত্তেজনায় জ্বলে উঠল। ভাবল এই তো সুযোগ! ছেলেটাকে সরাতে পারলে তবুও তো কিছুটা দায় কমবে। সেই মুহূর্তে রমানাথের কাছে পিতৃস্নেহ মিথ্যা বলে মনে হলো। নিজেকে বাঁচাবার জন্য দরকার হলে সে সব করবে।

কিন্তু......না, না, এ কি ভাবছে সে! নিজের মনকে ধিক্কার দেয় রমানাথ। উত্তেজনার বশে এ কি সে ভাবছে! ছেলেটা তো কোন দোষ করে নি। পর মুহূর্তেই তার মনে হল, না না, ওকে শেষ করতেই হবে! রমানাথের শয়তানী মনটা আবার জেগে উঠল। সমস্ত শরীর ওর কাপছে। নিজেকে সামলাতে পারছে না। অশান্ত উত্তেজনায় কাঁপছে ওর শক্ত হাতের পেশীগুলো।

মনে পড়ে যায় ওর মৃত স্ত্রীর কথাগুলো—"ওগো, ছেলেটাকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রেখ, ওকে তুমি মানুষ করো।"

সঙ্গে সঙ্গে ওর মনটা বলে ওঠে, "কাজলি, অনেক করেছি, আর পারলাম না তোর কথা রাখতে।"

পর মুহূর্তেই ওর শক্ত হাত দুটো চেপে বসে যায় ছেলেটার নরম গলায়।

আর দাঁড়াতে পারে না রমানাথ। চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে ছুটে যায় সামনের রাস্তার দিকে। আর সেই মুহূর্তেই মিল-মালিকের চলন্ত রোলস রয়েলসের তলায় তার দেহটা পিষে যায়। দূরে আকাশে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আর রোলস রয়েলসটা ছুটে চলেছে গ্রাণ্ড হোটেলের পার্টিতে।

এসেছে আনন্দ-ঋতু

প্রসূনকমল ভট্টাচার্য

মধুর শোভায় ভরেছে বসুধা, তমসা গিয়াছে টুটি,
ঝলমলে রূপ আকাশের বুকে উঠিছে আজিকে ফুটি।
ছায়া-সুশীতল পল্লীর কোলে শ্যামল মাধুরি হাসে,
পদ্ম-গন্ধ মৌন মারুতে আলোর সুরভি ভাসে।
নূতন গীতির ছন্দ উঠিছে করবী চাঁপার বাসে,
গন্ধ-তৃণের ঐ সুষমার হাসি বাঁকা নদীর পাশে।
নদীর জলেতে জোছনার ঐ ক্ষরিছে রজত-ধারা,
নদী কূলে-কূলে কাশের রেণু যে
পেয়েছে আজিকে ছাড়া।
গঙ্গা-ফড়িং লাফিয়ে চলে শিশির-ভেজা ঘাসে,
দেখ্ রে প্রজাপতির নাচন তারি আশে পাশে।
পানকৌড়ি মাছরাঙাদের দেখ্ রে মহোৎসব,
শোন্ রে আজি দোয়েল শ্যামার মধুর কলরব।
এমন মধুর আনন্দ ঋতু ব্যর্থ কেন রে হবে?
মাত্ রে আজি সবার সাথে প্রাণের উৎসবে॥

ছড়া

রাধারঞ্জন হালদার

গাছে বসে বুলবুল
খায় কতো জামরুল।
ছুটে এসে গিরগিটি
দেখে হাসে মিটিমিটি।
তাই দেখে কাক দুটি
হেসে খায় লুটোপুটি।

লিমেরিক

তপনজ্যোতি মিত্র

মহাদিদেব বসাক
আজানুলম্বিত জটায় তেল মাখাতেন ছটাক।
ভোরের বেলায় স্নানটি সেরে
ধ্যানে বসতেন ভাবের ঘোরে
ব্যোম ভোলানাথ—হাঁকে তিনি পাড়া কাঁপাতেন বেবাক।

নতুন মামা

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ্রাম্য স্কুল। ঘণ্টা পড়েনি। ক্লাসময় হৈ-হট্টগোল চলছে। হঠাৎ আমাদের হেডমাস্টারমশাই একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লাস নিশ্চুপ, পিন পড়লেও যেন আওয়াজ পাওয়া যায়। তিনি ছেলেটাকে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, "এই ছেলেটি তোমাদের সঙ্গে পড়বে।"

সমীর আমার পাশে বসেছিল। বলল, "জানিস্‌ ও আমার আপন মামা। ও এখন অনাথ হয়ে পড়েছে কিনা, সেই জন্যে আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়বে।"

কিন্তু কদিন পরে দেখলাম, মামা তার অসীম বীরত্বের কথা সবাইকে খুব গর্বের সঙ্গে বলছে। সে এমন ভাব দেখায় যেন, ভূতটুত কিছুই সে গ্রাহ্যই করে না। আমাদের স্কুলের সব থেকে ডানপিটে ছেলে কান্টুর এ বড়াই সহ্য হল না। সে আমাদের একদিন আড়ালে ডেকে বলল, "মামার বড়াইটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে। উচিত শিক্ষা দেব। আসুক না অমাবস্যা।"

ফন্দিটা সে আমাদের বলল। তারপর মামাকে গিয়ে বলল, "মামা, সামনেই অমাবস্যা। ক্ষ্যান্ত পিসীর বাগানের কাঁটাল চুরি করতে হবে। তোমাকে নেতা হতে হবে।"

বলা বাহুল্য, মামা এতে খুব খুশীই হল।

অমাবস্যার রাত। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। এমন অন্ধকার যে মানুষ পর্যন্ত চেনা যাচ্ছে না। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। জোনাকি দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে। আমরা সবাই এক জায়গায় মিলিত হয়ে সরু পথ ধরে মামাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম।

সামনেই সেই মনভোলানো কাঁটাল গাছটি। মামাকে গাছে উঠানো হল। কয়েকটা কাঁটাল নিঃশব্দে পেড়ে সে গাছ থেকে নামার সময় লাফ দিতে নামতে গিয়েই ঘটল এই অঘটন। মামা ভয়ে চীৎকার করে উঠল, "গেলাম, গেলাম, বাঁচাও—ভূঁত—ভূঁত—ভূঁ—"

আর কি সেখানে থাকা, দে ছুট। মামা ছুটছে সবার আগে। সেখানেও সে আমাদের নেতা।

ব্যাপারটা খুলেই বলি। ছেঁড়া কাগজ-নেকড়া দিয়ে কান্টু একটা কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি তৈরী করেছিল। এবং আগেই সেটা লুকিয়ে রেখে এসেছিল সেখানে গাছের আড়ালে। মামা তা জানত না। সে লাফ দেবার সময় কান্টু সেটা উঁচিয়ে ধরে। আর তার ফলে—

এর পর থেকে মামার মুখ যেন কে চাবি দিয়ে আটকে দিল। আমাদের সঙ্গে সে কথাই বলে না। আর সে বড়াইও চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল।

ঝগড়া

বিশ্বজিৎ বসাক

দুই শালিখের ঝগড়া বাঁধে
মাঝ উঠানের কাছে
টুটুন ভায়া এক দৃষ্টে
তাকিয়ে সেথায় আছে।
ভাষা তাদের যায় না বোঝা
কিচিরমিচির সার,
কেমন করে বুঝবে বলো—
হলোই বা কার হার।
ঘাড় ফুলিয়ে লেজ উঁচিয়ে
এ ওর ঘাড়ে পড়ে—
ধরবে না কি টুটুন ভায়া?
রাখবে নাকি ঘরে?
যেই না বলা অমনি তারা
কানটি করে খাড়া
ফুড়ৎ করে উড়ে গেল,
যেনই কত তাড়া।
টের পেয়েছে নাকি ওরা
করলো মিছে খেলা?
আসবে আবার বলেই বুঝি
কাটিয়ে দিলে বেলা।

ধাঁধা হেঁয়ালি

পরিচালক ঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

এবার কিশোর-কিশোরী বন্ধুদের জন্য শব্দ-হেঁয়ালির পরিবর্তে কয়েকটি ধাঁধা দেওয়া হলো। আশা করি, বন্ধুরা এই ধাঁধাগুলোর নির্ভুল উত্তর দিতে পারবে।

ধাঁধাগুলোর উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।

১। এমন একটি ইংরাজী শব্দ বল, যার
যার প্রথম দুই অক্ষরের অর্থ—উপরে,
আবার সম্পূর্ণ শব্দের অর্থও—
উপরে।

[সুমিত হালদার, কলিকাতা]

২। গল্প-শোনার বন্ধুরা ভাই গল্প হল
না শেষে,
কানে যদি বাজে তখন অপূর্ণতার
রেশ—
একটি কথা আছে শুধু বলার
গল্পের ধারা এগিয়ে নিয়ে চলার।

[শিবেশচন্দ্র দাশ, খড়্গপুর]

৩। খেতে লাগে বড় মজা, দেখতেও
ভালো—
কিন্তু দেখালে কেউ, মুখ করি
কালো।

[রাম চট্টখুণ্ডী]

৪। 'I'-এর পরে am বসে; কিন্তু I-এর
পরে is বসিয়ে একটা সঠিক বাক্য
তৈরি করতে পার কি?

[কমলেশচন্দ্র মণ্ডল]

৫। সাতটি দেশলাই কাঠি নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় সাজানো আছে—

VII=I

অর্থাৎ, seven is equal to one.

এখন তোমাকে যদি কেউ বলে, ঐ সমান চিহ্নের দুদিকে যে কোন একদিক থেকে একটি কাঠি সরিয়ে এমনভাবে বসাও যেন উভয়দিক সমান হয়, তুমি পারবে কি?

[রমেশ মুখার্জী, বর্ধমান]

গত মাসের শব্দ-হেঁয়ালির উত্তর ও নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

১ দো	য়ে	২ ল		৩ দ		৪ শ	৫ শ		৬ ন
কা		৭ ব	ল	শা	লী		৮ কু	বে	র
ন		ঙ্গ		ন			নি		হ
	৯ ট		১০ কা	ন		১১ দা		১২ পু	রি
১৩ কা	ল	কূ	ট			১৪ দ	১৫ খ	ল	
	ষ্ট		১৬ লে	নি	১৭ ন		ন		১৮ র
১৯ ব	য়	২০ ক	ট		২১ গ	২২ গ	ন		বা
ট		র্ণ		২৩ ত	র	জা		২৪ বা	হু
	২৫ মে	ধা	বী			২৬ ন	হ	ব	ত
২৭ পা	ম	র		২৮ প	ব	ন		র	

ঝর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা; চঞ্চল চৌধুরী, বাঁকুড়া; কল্যাণ, শুক্লা ও কল্পতরু ভট্টাচার্য, মাশিলা; দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর; পার্থ, গোপা ও গৌতম রায়,

গড়িয়া; শীলা ও কপিল, কৃষ্ণনগর; শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত, কলিকাতা ১৯; গৌতম, সিদ্ধার্থ ও নিবেদিতা সেনগুপ্ত, কল্যাণী, মলয়, শঙ্কর ও মৌসুমী সাহা, দুর্গাপুর ৯; বাণীব্রত মণ্ডল, কলিকাতা ১০; সুবীর, কাবেরী ও গৌতম সরকার, বালুরঘাট; সতীনাথ ও বাণীভূষণ ষড়ঙ্গী, চিত্তরঞ্জন; মিলন বসু, কলিকাতা ১১; দেবাশীষ ও পারুল প্রামাণিক, কলিকাতা; দীপঙ্কর ও রঞ্জনা ভট্টাচার্য, নতুন দিল্লী ৬; জগন্নাথ ও বলরাম আচার্য, কলিকাতা ২৬; অমিতকুমার সেনগুপ্ত, তার বাবা ও মা, কলিকাতা ৯; মহম্মদ হায়াতুল্লাহ ও আনার আলী, ঘোল্লা; স্বপনকুমার ঘোষ, জজান; বিনতা, শ্বেতা রায় ও তাদের মা, কৃষ্ণনগর; রঞ্জনকুমার ও সুস্মিতা পাত্র, কলিকাতা ২২; অঞ্জলি দাশগুপ্ত, কলিকাতা ৯; অরুন্ধতী ও হিমজ্যোতি রায়চৌধুরী, কলিকাতা ১৯; মৌলী দত্ত, কলিকাতা ২৯; বিশ্বজিৎ ও চিরশ্রী ব্যানার্জী, ইছাপর; ফাল্গুনী চক্রবর্তী, রহড়া; সঞ্জয়কুমার গুপ্ত. কলিকাতা ৪; ওঙ্কারনাথ চট্টোপাধ্যায়, আগরতলা; আরতি, সুমিতা ও পার্থপ্রতিম সিংহ, কলিকাতা ৫৪; অনুপ, কাবেরী ও রামরঞ্জন ব্যানার্জী, হরিপাল; তপতী সিংহ সরকার, রিতা সিংহ রায় ও দেবাশীষ সরকার, টৌনিয়া; আশীষকুমার মণ্ডল, নৃপেন্দ্র নাথ নিয়োগী ও দেবীদাস চ্যাটার্জী, আসানসোল; তাপসকুমার সেন, সম্বলপুর; মনোজ, কল্লোল ও কুমকুম সেনগুপ্ত, বাঁশবাড়ী; শর্মিলা, ঐন্দ্রিলা ও অভিজিৎ মুখার্জী, হাবড়া; তরুণকান্তি, তুষারকান্তি ও পাপিয়া চট্টরাজ, ডায়মণ্ড-হারবার; রতন মহাপাত্র ও কিংকর প্রসাদ পাল, বল্লভপুর; মৌসুমী ও সুবীর মণ্ডল, কলিকাতা ১৩; বৈদ্যনাথ ও মানসী চক্রবর্তী, নৈহাটী; আরুণি ও অরুষার্ক সেন, রাজা রামমোহনপুর; জিম্বো, টিংকু ও জেলী, কামালঘাট; তাপস, মানস ও কণিকা দত্ত, ডিমডিমা চা বাগান; সমরকুমার চন্দ, জওহরলাল মণ্ডল ও অনিতা চন্দ, দুর্গাপুর; শিশির রায়নাথ, ডিমডিমা চা বাগান; শঙ্করলাল সাহা, শ্রীরামপুর; প্রদীপ কুমার, পূর্ণিমা ও প্রতিমা রায়, কলিকাতা ৩০; বন্দনা, কল্যাণ ও গৌতম কুমার, ভোঁপুর; জয়ন্ত মজুমদার, কলিকাতা ২৭; দেবাশিস, সুতপা সাহা ও শান্তনু ঘোষ. কলিকাতা ৫২; নন্দিতা, বন্দনা ও মৃণাল দে, হাফলং; প্রদীপ, সুলেখা ও বাণী মোদক, মোদকপাড়া; পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৯; লেখা রায়, হালতু; মধুসূদন চন্দ, দুর্গাপুর ৪; সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, শিবানী ও অরুণময় ঘোষাল, দাশনগর; তপতী, ব্রততী ও জয়তী পুরকাইত, মানখণ্ড; বুজন, অরূপ ও অনুপ, লোদনা; অরূপকুমার চক্রবর্তী ও নির্মল ঘোষ, দুর্গাপুর ৩; সুনীল, হুগলী; অমিতাভ ও নন্টু শীল, কলিকাতা ৬; সুরজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনিময় ভট্টাচার্য, ধানবাদ; সুনন্দা, ইন্দ্রানী ও প্রশান্ত পাল, হাওড়া ২; কল্যাণ ও কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, বজবজ; দেবপ্রসাদ দেবোপম ও দেবোত্তম আচার্য, বেগমপুর মতিহারী; বাপী, বুড়ি ও রাঙ্গাদা, বীরপাড়া; অশোককুমার পাণিগ্রাহী, বাথুয়াড়ী; দেবাশিস অধিকারী, কান্দী; বিমল, রাজেন্দ্র ও কনকলতা শেঠী, অরঙ্গাবাদ; পূরবী ও শঙ্কর কবিরাজ, তপন রক্ষিত, গোবরডাঙ্গা; সুপর্ণা মল্লিক, কলিকাতা ৩৭; অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও তার বাবা, রবীন্দ্রনগর; গৌতম প্রকাশ গোস্বামী, হুগলী; তপতী, মিনতী ও শ্যামল চক্রবর্তী, জাঙ্গীপাড়া; লক্ষ্মীকান্ত, তাপস ও চিত্রা ভট্টাচার্য, জাঙ্গীপাড়া; সত্যজিৎ অভিজিৎ ও শুভা সিংহ, কেরানীটোলা; অরুণা মুখোপাধ্যায়, নতুন দিল্লী ৩; সুকান্ত, স্বপ্না ও শান্তা ঘটক, কৃষ্ণনগর।

টুকরো হাসি—একটু হাসো!

বিরিঞ্চিবাবু: ও পিয়ন মশাই, আমার কোন চিঠি-পত্তর আছে নাকি?

পিয়ন: তা' আপনার নামটা কি বলুন।

বিরিঞ্চিবাবু: তার আবার কি দরকার। চিঠিতেই তো আমার নাম দেখতে পাবেন!

—সৈয়দ সুশোভন রফি

সংবাদ-বিচিত্রা ● ভেনজুয়ালা ঘাস

ভারতবর্ষের একটি বোটানিক্যাল গার্ডেনে আসাম হতে বিশেষভাবে আনিয়ে একপ্রকার ঘাসের চাষ করা হয়েছে। এই ঘাসের আসল বাড়ী হল দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে। ডক্টর এডওয়ার্ড মর্গ্যান নামে জনৈক ভদ্রলোক এর উপকারিতা আবিষ্কার করেন। এই ঘাসের উপকারিতা হল এই যে যেখানে এর চাষ হবে সেখানে কাছাকাছি কোথাও মশামাছি আসবে না, এমনকি সাপও এই ঘাস থেকে দূরে থাকে। এছাড়া এই ঘাস ঘোড়া ও গরুর উপকারী খাদ্য। শুষ্ক আবহাওয়াতেই এই ঘাস ভাল হয়। এর নাম দেওয়া হয়েছে ভেনজুয়ালা ঘাস।

—সতীরঞ্জন আদক

• পরিচালক •

কিশোর বিজ্ঞানী

নিজে করো

ম্যাজিক ডিম

অণুবীক্ষণ সমাদ্দার

তোমরা ডিম দিয়ে করতে পার, এমন দুটো মজার বিজ্ঞানের খেলা শিখিয়ে দিচ্ছি। এগুলো দেখিয়ে বন্ধুদের কাছে বেশ 'বাহবা' পেতে পার।

প্রথম খেলাটার জন্য দরকার একটুখানি হাই-ড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। একটা পাত্রে কিছুটা জল দিয়ে অ্যাসিডটা ঢেলে দাও। এখন একটা ডিম ঐ অ্যাসিড-গোলা জলে ছেড়ে দাও। ডিমটা প্রথমে ভুস করে ডুবে যাবে। এবার লক্ষ্য কর, একটা বাষ্পের বুদ্বুদ উপর দিকে উঠে আসছে কিনা। যেই দেখবে ঐ বুদ্বুদটা, সঙ্গে সঙ্গে বেশ ভারিক্কী চালে আদেশ করবে ডিমটাকে জলে ভেসে উঠতে। আর কি আশ্চর্য! সব্বাইকে অবাক করে দিয়ে ডিমটা উপরে ভেসে উঠবে।

আবার একটা বুদ্বুদ ডিমটার কাছ থেকে নীচে যেতে যেই দেখবে, তক্ষুণি আদেশ করবে ওটাকে জলে ডুব মারতে। তৎক্ষণাৎ সব্বাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে টুপ করে জলে ডুবে পড়বে ডিমটা। সবাইয়ের কাছে তুমি দারুণ ম্যাজিসিয়ান বনে যাবে। একের পর এক তোমার কথামত ডিমটা উপরে উঠে পোঁ পোঁ করে ঘুরে, টুপ করে ডুবে যেতে থাকবে।

দ্বিতীয় খেলার জন্য সামান্য পারদ দরকার। একটা ডিমের গায়ে ফুটো করে ভেতরের অংশগুলো বাইরে বের করে ফেলতে হবে। তারপর ঐ ফুটো দিয়ে ডিমের ভিতরে একটু পারদ ঢেলে দিয়ে এক টুকরো মোম দিয়ে ফুটোটা বন্ধ করে দেবে। এবার ডিমটা একটু গরম করে মেজেতে ছেড়ে দিলেই, বন্ধুদের অবাক করে সেটা সুড় সুড় করে চলতে শুরু করবে। আচ্ছা অদ্ভুত তো!!

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

অণুবীক্ষণ সমাদ্দার

॥ এক ॥

কোনো কোনো দেশে এক বিচিত্র ধরনের মাছ দেখা যায়, যারা বাসা করে। নদী বা সাগরের তীরে যে সব ঝোপ থাকে, সেইখানে পাখির মত ঘাস, লতাপাতা, শ্যাওলা দিয়ে বাসা তৈরি করে। আর আশ্চর্য! এই বাসাতে ডিম পেড়ে তাদেরকে ডিমে তা' দিতেও দেখা যায়!

॥ দুই ॥

আফ্রিকার এক ধরনের মাকড়সা, তারা যে জাল তৈরি করে, তা নাকি খুব শক্ত। সহজে ছেঁড়ে না, আর আকারেও বড়। তাই এগুলো দিয়ে আদিবাসীরা বেশ আনন্দেই মাছ ধরে।

॥ তিন ॥

ব্রেজিলের অতিকায় মাকড়সা বিখ্যাত। তারা দারুণ রাক্ষুসে স্বভাবের। তারা খায় কি জানো? ইঁদুর, গিরগিটি, ব্যাঙ থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট পাখীও তাদের খাদ্যতালিকা থেকে বাদ যায় না।

॥ চার ॥

সমুদ্রের পাখাওয়ালা মাছদের বলে উড়ুক্কু মাছ। তারা সত্যিই কিন্তু উড়তে পারে না। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে লাফিয়ে উঠে ঝাঁক বেঁধে, বেশ কিছুটা ডানায় ভর করে গিয়ে ঝুপ্ করে জলে পড়ে যায়। তারা পাখায় ভর দিয়ে কিন্তু সিকি মাইল পর্যন্ত যায়। আর তখন সত্যিই এদের উড়ুক্কু দেখায়।

ঘোষক

চলচ্চিত্রে বিপ্লব ঃ ইঞ্জিনীয়ার থেকে চলচ্চিত্রকর

১৯১৮ সাল। ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের কাল। নভেম্বর মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলো। রুশ দেশের বিপ্লবীরা লেনিন-পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অত্যাচারী জারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সরকার গঠন করেছে। কিন্তু তাঁদের নির্বিঘ্নে শাসন-কার্য পরিচালনার সুযোগ দিতে চায় না সারা পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে ভীষণ গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় রাশিয়ায়।

দেশের প্রতিবিপ্লবী চক্রকে সমর্থন করে বিপ্লবী সোভিয়েট সরকারের পতন ঘটাবার জন্য গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, আমেরিকা, ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি চোদ্দটি রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী বিনা যুদ্ধ ঘোষণায় সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করে বসল। জারের আমলের অ্যাডমিরাল কোলচাক, কশাক কমাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল কর্নিলভ প্রভৃতিকে এই বিদেশী রাষ্ট্র-গুলি অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ রসদ ইত্যাদি দিয়ে সর্বরকমে সাহায্য করতে লাগল।

রাশিয়ার শ্রমজীবী জনসাধারণ ও বিপ্লবীদের সেদিন জীবন-মরণ সমস্যা। দেশবাসীর সামনে শুধু একটি প্রশ্ন—পুরনো শাসন-ব্যবস্থা, না নতুন সমাজ-ব্যবস্থা? মহাকালের জিজ্ঞাসাঃ কোন্ পথ? গণতন্ত্র, না ধনতন্ত্র?

এই জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব রক্তের অক্ষরে লেখার জন্য বিপ্লবী খেটে-খাওয়া মানুষদের পাশে এসে দাঁড়াল বুদ্ধিজীবীরা। শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে রাইফেল তুলে নিল সাহিত্যিক-শিল্পীরা। গঠিত হলো নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত বিপ্লবী সেনাদল—লালফৌজ!

তরুণ ইঞ্জিনীয়ার সার্গেই আইজেনস্টাইন নামে এক যুবকও যোগ দিয়েছেন এই বিপ্লবী লালফৌজে। সীমান্ত অঞ্চলের ট্রেঞ্চে অন্য সৈনিকদের সঙ্গে তিনিও আছেন। হঠাৎ তাঁর হাতে এল ব্রিটিশ মিলিটারী মিশনের টাকায় মুদ্রিত এক প্যামফ্লেট বা পুস্তিকা। এই পুস্তিকায় বলা হয়েছে, জেনারেল কর্নিলভ হচ্ছেন রাশিয়ার আদর্শ বীরপুরুষ, মুক্তিযোদ্ধা। বিপ্লবী নেতাদের নামে চূড়ান্ত কুৎসা রটনা করা হয়েছে—তারা হচ্ছে পাক্কা বদমাইস। আর লেনিন তো জার্মানীর গুপ্তচর, নইলে রুশ-জার্মান যুদ্ধ চলাকালে জার্মানীর মধ্যে দিয়ে ট্রেনে করে তিনি দেশে ফিরলেন কি করে? এই ধরনের নানা মিথ্যা কথা প্রচার করা হয়েছে রুশ জন-সাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য।

এইসব অপপ্রচারে আইজেনস্টাইন খুবই বিচলিত হন এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সঙ্কল্প করেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বসে তো আর প্রচারপত্র ছাপিয়ে সকলের মধ্যে বিলি করা চলে না। সেখানে প্রেস নেই, টাইপ নেই, কম্পোজিটার বা প্রিন্টারও নেই। অথচ বাধা অতিক্রম করে উদ্দেশ্য সিদ্ধিই হচ্ছে বিপ্লবীর কর্তব্য। তাই তিনি প্রচার-কার্যের জন্য লেখার বদলে আঁকার মাধ্যমটি গ্রহণ করলেন। পোস্টার এঁকে তাঁর বক্তব্য সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে থাকলেন।

বিপ্লবী ইঞ্জিনীয়ার আইজেনস্টাইন হলেন চিত্রকর আইজেনস্টাইন। কাগজে তিনি যে রেখা টানেন, সেগুলি যাতে লোকের মনে গভীর রেখাপাত করে—এই হয় তাঁর একমাত্র চিন্তা। এই সময় লেনিনের আর

একটি কথা তাঁকে এক নতুন পথের নির্দেশ দিল, বক্তব্য পরিবেশন করার নতুন আর এক মাধ্যম সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে সচেতন করে তুলল।

লেনিন ছিলেন এক অসাধারণ মানুষ, সারা পৃথিবীর মানবসমাজের সবকিছু সংবাদই তিনি রাখতেন। ইউ-রোপ ও আমেরিকার কয়েকজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ও শিল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিশ্রম দ্বারা চলচ্চিত্র নামে এক নতুন শিল্প-মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন, তা লেনিনের অজানা ছিল না। তিনি বললেন, 'চলচ্চিত্র এ যুগের এক শক্তিশালী শিল্প-মাধ্যম।'

লেনিনের এই উক্তি আইজেনস্টাইনের মনকে বিপুল-ভাবে নাড়া দিল। তিনি স্থির করলেন, যুদ্ধ শেষ হোক, চিত্রকর থেকে তিনি চলচ্চিত্রকর হবেন। তাঁর ছবি 'শুধু পটে লেখা' হবে না। ছবিকে নড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষের মনকেও নাড়া দেবেন। বিপ্লবীর নির্মিত চলচ্চিত্র বলবে নতুন কথা, সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র-জগতে বিপ্লব এনে দেবে।

তারপর গৃহযুদ্ধ শেষ হল এক সময়। সোভিয়েট ভূমি-ছেড়ে পালাল পরাজিত দেশী-বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলের দল। গৃহযুদ্ধের পরে রাশিয়ার বিপ্লবী সরকার সারা দেশে নবজীবনের জোয়ার এনে দিল। পুরনো গতানুগতিক ধারা ত্যাগ করে আইজেনস্টাইনও নামলেন নতুন চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র বিপ্লবী নবজীবনের বার্তা বহন করে নিয়ে গেল দেশদেশান্তরে।

সে ছবি দেখে চমকে উঠল অন্যান্য দেশের দর্শকরা। তারা উপলব্ধি করল, রুশ-বিপ্লব শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তা প্রসারিত হয়েছে। রাশিয়ার ছবির সঙ্গে অন্যান্য দেশের ছবির বিরাট পার্থক্য। বিপ্লবী রাশিয়ার নব-যুগ-সৃষ্টিকারী এই চিত্রনির্মাতাদের পরোগামীরূপে দুজন অসাধারণ প্রতিভাশালী চিত্রপরিচালকের নামের সঙ্গে বিশ্ববাসী পরিচিত হলো। তাঁরা হচ্ছেন সার্গেই আইজেনস্টাইন ও পুডোভ্‌কিন।

এখানে রাশিয়ার ছবির সঙ্গে অন্যান্য দেশের ছবির পার্থক্যটা বোধহয় একটু বিশদভাবে বলা দরকার।

আমরা জানি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে চল-চ্চিত্রের জন্ম হয়। জন্মকালে এই শিশু শিল্পটির ভবিষৎ সবারই অজানা ছিল। প্রথমে সূতিকাগৃহে অর্থাৎ গবেষণাগারে কিছু বৈজ্ঞানিকসুলভ কৌতূহলই ছিল শিশু শিল্পটির সম্বল।

ধীরে ধীরে শিল্পটির বয়স বাড়তে লাগল। সে পদার্পণ করল গবেষণাগার থেকে প্রেক্ষাগারে। তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে আদর করতে লাগল ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানী, সুইডেন প্রভৃতি দেশ। তার পিতৃ-ভূমি আমেরিকা সবিস্ময়ে এইসব কান্ডকারখানা দেখতে লাগল। শিল্পটি সূতিকাগৃহে থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই গ্রিফিথ-মেলিয়োঁ প্রভৃতি পরিচালকরা তাকে সস্নেহে সাহিত্যের নন্দনকাননে নিয়ে এলেন খেলা করার জন্য। অনেক রূপকথাধর্মী কাহিনী শোনালেন তাকে।

এবার কিছু ধনী ব্যবসায়ী ব্যক্তি শিল্পটিকে পোষ্য-পুত্ররূপে গ্রহণ করল। প্রভূত অর্থের অধিকারী হলো সে। প্রাচুর্য, বিলাস, আমোদ-প্রমোদের মধ্যে তার দিন কাটতে লাগল।

তারপর এল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক। শিল্পটি যৌবন লাভ করল। সে যে কি অমিত শক্তির অধি-কারী, তা অন্য কেউ না বুঝলেও সে-যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ও মনীষী লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর সেই অভ্রান্ত উক্তি অনুপ্রাণিত করল শুধু আইজেন-স্টাইনকেই নয়, রাশিয়ার অন্যান্য বিপ্লবী চলচ্চিত্র-নির্মাতাদেরও। তাঁরা স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীদের কবল থেকে শিল্পটির বন্ধনমুক্তি ঘটালেন।

এত দিন যাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করছিলেন, তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, দর্শকদের খানিকটা আনন্দ দান করে অর্থ উপার্জন করা—তা সে-আনন্দ আবিলই হোক, আর অনাবিলই হোক। কিন্তু রাশিয়া যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করল, তার উদ্দেশ্য হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যান্য দেশের ছবির মতো সোভিয়েট ছবি কেবল প্রমোদের জন্য নির্মাণ করা হলো না।

বিপ্লবের পরে চলচ্চিত্র শিল্পকে সেখানে রাষ্ট্রীয়করণ করা হলো, অর্থাৎ যে কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থে নিজের খেয়াল-খুশিমতো সেখানে ছবি করতে পারবে না। সরকারী অনুমোদন ও সাহায্যে ছবি নির্মিত হবে। তাতে থাকবে দেশের সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উন্নতির কথা, নতুন আদর্শের কথা। সে ছবি দর্শকদের যেমনে আনন্দ দেবে, তেমনি অনুপ্রাণিতও করবে। নিগূঢ় অর্থে রুশ ছবিগুলি হচ্ছে শিক্ষা-মূলক ছবি। চিত্রগুলির বিষয়বস্তু সাধারণ নয়, গভীর অর্থপূর্ণ। সেগুলি নতুন সমাজগঠনকারী জনগণের জীবন ও স্বার্থ প্রতিফলনকারী।

এই বাস্তব জীবনকে ছবির পর্দায় ফুটিয়ে তোলার জন্য সোভিয়েট পরিচালকরা ক্যামেরাকে স্টুডিওর অভ্যন্তরে আবদ্ধ না রেখে, নিয়ে গেলেন বাইরে—পথে-ঘাটে, অরণ্যে-প্রান্তরে, শহরে-গ্রামে, কৃষিক্ষেত্রে-কারখানায়, দুর্গে-প্রাসাদে, কুটিরে-বস্তিতে। অভিনয়ের ধারাকেও তাঁরা দিলেন বদলে। আমেরিকা পেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে ছবি তুলছিল। রাশিয়া পেশাদার অভিনেতাদের বাদ দিয়ে ক্যামেরার সামনে নিয়ে এল সাধারণ মানুষদের—কৃষক, মজুর, নাবিক, সৈনিক প্রভৃতিদের।

সোভিয়েট দেশে চিত্রনির্মাণকারীরাও এলেন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী, সৈনিক, শ্রমিক ও থিয়েটার-কর্মী। তাঁরা অর্থোপার্জনের জন্য চিত্র নির্মাণ করতে এলেন না, এলেন এই নবজাতক শিল্পটিকে ভালবাসেন বলে। চিত্রজগতে এসে তাঁরা অন্যান্য দেশের চিত্র-রসিকদের দেখিয়ে দিলেন 'সিনেমা-আর্ট' কাকে বলে। তাঁরা তাবৎকালের সমস্ত গবেষণা ও পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে চিত্রনির্মাণের নিয়মকানুন, ব্যাকরণ-সূত্র ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন। চিত্র-সম্পাদনার মধ্যে এক নতুন ধারা আনলেন। 'মন্তাজ' নামে এক চিত্রনির্মাণ কৌশলের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

চিত্রজগতের গুরুর আসনে বসলেন দুজন রুশ পরিচালক, আর তাঁদের কাছে পাঠ নিলেন সারা পৃথিবীর চিত্রনির্মাতারা। এই দুই রুশ পরিচালকের মধ্যে আইজেনস্টাইন চিত্রজগতে কিভাবে এলেন, সে কথা আগেই বলেছি। তাঁর নির্মিত ছবির কথা ও পুডোভ্কিনের কথা বারান্তরে বলব।

আমিই আমার অভিভাবক

জনবহুল রাজপথ। ব্যস্ত পথচারীরা যে যার গন্তব্য-স্থলের উদ্দেশ্যে দ্রুতপদে চলেছেন। হঠাৎ এক বয়স্ক ব্যক্তি পা পিছলে ডিগবাজি খেলেন, সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ল তাঁর মাথার টুপি। গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আকস্মিক পতনের কারণটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন—একটি কলার খোসাই তাঁর বিপর্যয়ের হেতু। এই রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাজপথে কোন্ কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি এই অপকর্মটি করে রেখেছে, তাই ভাবতে ভাবতে তিনি আবার দ্রুত তাঁর গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে চললেন। যাবার আগে অবশ্য কলার খোসাটা পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে গেলেন।

কিন্তু কয়েক মিনিট বাদে আবার একজন সেখানে আছাড় খেলেন। সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক চার্লি চ্যাপলিন। সকলে যখন লোকটির পতনের কারণস্বরূপ কলার খোসাটির প্রতি বিষদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, চার্লি চ্যাপলিনের তীক্ষ্ন দৃষ্টি কিন্তু তখন আর একটি জল-জ্যান্ত বস্তুর ওপর নিবদ্ধ। বস্তুটি অবশ্য নেহাতই একটি বাচ্চা ছেলে—রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে দুষ্টুমি-ভরা চোখে তাকিয়ে আছে আর মুখ টিপে হাসছে। বলা বাহুল্য, ছেলেটিই নিজে কলাটি খেয়ে ইচ্ছে করে কলার খোসা রাস্তার মাঝখানে রেখে পথচারীদের কলার পরিবর্তে আছাড় খাওয়াচ্ছে।

চার্লি চ্যাপলিন সোজা ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেলেন। তাঁর নতুন ছবি কিড (Kid)-এর জন্য একটি দুষ্টু ছেলের দরকার। যা তিনি খুঁজছিলেন, তা পেয়ে গেলেন।

তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছবিতে অভিনয় করবে?

ছেলেটি বয়স্কের মতো বলল, ভেবে দেখতে পারি।

—আচ্ছা, তুমি ভেবে দেখ। তার আগে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—তার প্রয়োজন নেই। আমার সঙ্গেই বলতে পার। আমিই আমার অভিভাবক।

চার্লি বুঝলেন, ভালমতো 'এঁচোড়ে পাকা' একটি বালখিল্যের পাল্লায় পড়েছেন তিনি। যাই হোক, এ রকম একটা ছেলেই তাঁর দরকার।

শেষ পর্যন্ত এই ছেলেটিকেই তিনি ছবিতে নামালেন।

সারা বিশ্ববাসী ছেলেটির সঙ্গে পরিচিত হলো, মুগ্ধ হলো তার অভিনয়-প্রতিভায়।

ছেলেটির নাম জ্যাকি কুগান—নির্বাক যুগের শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেতা।

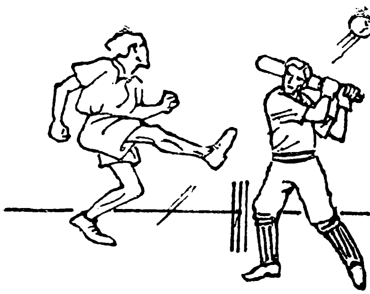

খেলাধুলা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

শরীরটাকে সুস্থ রাখো

অনেকদিন পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বুবুর সঙ্গে। আমি তো প্রথমে চিনতেই পারি নি। চেনা-চেনা লাগছে—অথচ কিছুতেই মনে পড়ছে না, আমি তাই পাশ কাটিয়েই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে আমার জামার কলারে টান পড়লো আর সেই সঙ্গে কানে এল অতি-পরিচিত গলা, "কি রে চিনতে পারছিস নে?"

গলা শুনেই চিনলাম। আমি তখন রীতিমত অবাক। বলি, "দারুণ চেহারা হয়েছে তো তোর!"

হা হা করে গলা ছেড়ে হেসে উঠলো বুবু, বললে, "জানিস, সক্কলে এই একই কথা বলে!"

"তা তো বলবেই, কিন্তু তুই এমন সুঠাম চেহারাটি কি করে বাগালি বল্ তো?"

"কি করে আবার—রোজ নিয়ম-মাফিক ব্যায়াম করে।"

হঠাৎ আমি কাসতে শুরু করলাম। কিছু দিন ধরে এমন কাসি হয়েছে—কোন ওষুধেই সারছে না! ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি কাসিতে।

আমায় কাসতে দেখে তার কথা শুনে হাসি চাপবার ফল কিনা ভেবে বুবু প্রথমটা একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেও একটু বাদেই আসল কারণ বুঝতে পারে। বললে, "শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাসতে শুরু করেছিস তো! কিছুতেই কমছে না নিশ্চয়ই!"

আমি মাথা নাড়লাম। বুবু বললে, "তুই রোজ সর্বাঙ্গ আসন শুরু কর্ তো। দেখবি—গলার অসুখ সব সেরে যাবে। শুধু তাই নয়, ঐ আসনটা করলে টনসিল আর লালাগ্রন্থির জোর অনেক বেড়ে যায়, ফলে অসুখ-বিসুখ প্রতিরোধ করার শক্তিও যায় বেড়ে।"

"কি করে করতে হয় সর্বাঙ্গ আসন?"

"তুই কি রে? এরই মধ্যে ভুলে গেলি! ছোটবেলায় আমরা তো রোজই করতাম এই ব্যায়ামটা। ঐ যে চিত হয়ে শুয়ে হাতের সাহায্য নিয়ে পা দুটো

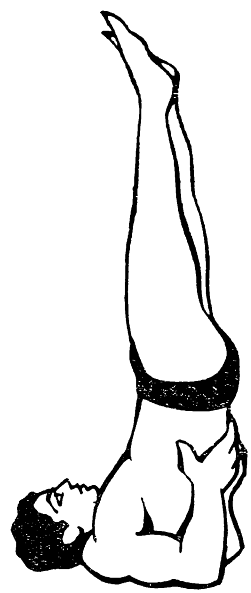

১ নং ছবি

ওপরে তুলতে হবে। ধরতে গেলে, ঘাড়ের ওপর থাকবে সমস্ত শরীরটা। কাঁধ আর পা থাকবে সোজাসুজি অর্থাৎ সমান্তরাল রেখায়। চিবুক ঠেকে থাকবে বুকে।"

"শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ রাখতে হবে নাকি?"

"না রে, বন্ধ রাখার কোন দরকার নেই। ধীরে ধীরে দশ-বারো বার নাক দিয়ে নিয়ে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে।"

"রোজ কবার করে করতে হবে?"

"তিন-চার বার করে সপ্তাহে ছ দিন করলেই চলবে। আর প্রত্যেকবার আসনের শেষে চিত হয়ে

শুয়ে চোখ বন্ধ করে দেহটাকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে।”

কথা বলতে বলতে আমি আর বুবু রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ বুবু বললে, “তুই যে দিব্যি ভুঁড়িদাস বনে গেলি রে! পেটটা যে তোর দিন দিন মোটা হচ্ছে!”

“খেলা ছাড়লে একটু-আধটু ভুঁড়ি হয়ই।”

আমার কথা শেষ হলো না, বুবু থমকে দাঁড়াল আচমকা। তারপর যেন চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বললে, “আমার হয়েছে? আমিও তো তোরই সঙ্গে খেলা ছেড়েছিলাম।”

“তুই নিশ্চয়ই ব্যায়াম করিস।”

“করিই তো! তুইও কর্। তুই সর্বাঙ্গ আসনের সঙ্গে পবন মুক্তাসনটাও কর্। খুবই সোজা। চিত

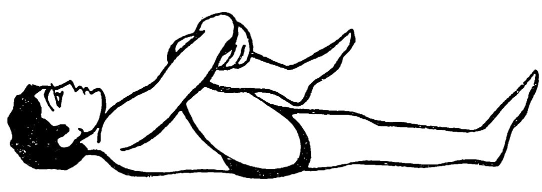

২ নং ছবি

হয়ে শুয়ে ডান পাটা হাঁটুর কাছে মুড়ে বুকের খুব কাছে দু হাত দিয়ে চেপে ধরতে হয়। এইভাবে ছয় থেকে আটবার দম নিয়ে ছাড়তে হবে। তারপর ডান পা ছড়িয়ে দিয়ে বাঁ পা-টাকে ঐভাবে বুকের কাছে আনতে হবে। এরপর দু-পা একসঙ্গে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে দম নিতে আর ছাড়তে হবে। এই ভাবে রোজ তিন-চার বার করে করলেই যথেষ্ট।”

একটু থেমে বুবু আবার শুরু করে, “এতে হবে কি জানিস? পেটের চর্বি কমে যাবে। পেট ফাঁপা, অম্বলের দোষ বা বায়ুরোগ থাকলে সেসবও কমে যাবে। শুধু তাই নয়, এই আসনটা কোষ্ঠ-বদ্ধতাও দূর করে। আমি বলছি, তুই করে দেখ্—উপকার পাবি।”

হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্রায় ঠনঠনে কালীবাড়ীর কাছে এসে গিয়েছিলাম। আর ঐখানেই বুবুদের বাড়ী। জোর করে সে আমায় ধরে নিয়ে গেল ওদের বাড়ীতে। অনেক দিন বাদে বন্ধুর বাড়ী গিয়ে অনেক মজা তো হলোই, আর সেইসঙ্গে জেনে এলাম ব্যায়ামের বিষয়ে অনেক কিছু। ভবিষ্যতে সেইসব কথা নিয়ে আবার লেখবার ইচ্ছে রইল।

হুক ও পুল

বাপ্পাকে বলে বলে আর পারলাম না। ও ক্রস ব্যাটে খেলবেই। অথচ ভাল খেলায় স্ট্রেট ব্যাটে না খেললে খুব তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

অফ স্টাম্পের ওপরে বল, অথচ ও ঘুরিয়ে ঝাঁটা চালানোর মতো ব্যাট চালিয়ে মারছে লেগের দিকে। ফস্কে গেলে আর দেখতে হবে না! আউট, একেবারে বোল্ড! তাই ওকে হুক আর পুল করার কায়দা শিখিয়ে দিয়েছি। দুটো মারই ক্রস ব্যাটে। সুতরাং ওকে আর পায় কে! শুধু হুক আর পুল করছে আর পটাপট রান তুলছে। কিন্তু ও জানে না, একটু বুদ্ধিমান বোলার এলেই ওকে চট করে আউট করে দেবে।

যাই হোক, হুক আর পুল মার দুটো কি আর কেমন করে করতে হয়, তাই আমাদের জানতে হবে সবার আগে। হুক আর পুল কিন্তু একই রকম প্রায়। দুটো মারের মধ্যে তফাত খুবই কম। যে বলগুলো মাটিতে পিচ খাওয়ার পর লাফিয়ে ওঠে (বাম্পার বল), সেই বলগুলোয় হুক করতে হয়।

অফ স্টাম্প কিংবা অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে যে বলগুলো একটু আস্তে আসে, সেগুলোকে ঘুরিয়ে লেগের দিকে মারাকে বলে পুল করা। আর লেগ স্টাম্প, মিডিল স্টাম্প কিংবা লেগ স্টাম্পের বাইরে লাফিয়ে ওঠা ফাস্ট বলগুলোকে ঘুরিয়ে লেগের দিকে মারাকে বলে হুক করা। হুক আর পুল করতে জানলে খুব তাড়াতাড়ি রান তোলা যায়। আর ফাস্ট বোলাররাও বাম্পার বল দিয়ে ব্যাটসম্যানকে ভয় দেখাতে পারে না। কারণ, যে ব্যাটসম্যান হুক করতে ওস্তাদ, বাম্পার বল পেলে সে ঘুরিয়ে মারবেই বলটা।

হুক মারটা খুব সোজা। বাপ্পা তো একদিনেই শিখে গেছে। কি ভাবে হুক করতে হয় শোন।

ধরা যাক, একটা বল লেগ স্টাম্পের ওপর আসছে আর মাটিতে পিচ খাওয়ার পর অনেকখানি লাফিয়ে উঠেছে। বলটা দেখেই ব্যাটসম্যান হুক করার জন্যে তৈরী হয়ে গেল তার ডান পা স্টাম্প ছাড়িয়ে গেছে, পায়ের টো অনেকটা মিড অফের দিকে। ব্যাট থার্ডম্যানের মুখো। ব্যাটসম্যানের পা আর শরীর

বলের লাইনের বাইরে এমন ভাবে সরিয়ে আনতে হবে, যাতে বলটা বাঁ পাশে থাকে। এইবার কষে হাঁকাতে হবে ব্যাট। ব্যাটে লাগার পর বলটা স্কোয়ার লেগ আর ফাইন লেগের মধ্যে দিয়ে ছুটবে বাউণ্ডারীর দিকে।

১ নং ছবি

এক নম্বর ছবিটা হচ্ছে বলটা মারার আগের মুহূর্তের আর দু নম্বর ছবিটা হলো বলটা মারার পরের মুহূর্তের অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায় কি দেখা যাচ্ছে? ব্যাটসম্যানের সমস্ত শরীরটা ঘুরে গেছে লেগের দিকে। ব্যাটের ব্লেড রয়েছে উইকেট-রক্ষকের দিকে পেছন করে। ব্যাটসম্যানের বুক স্কোয়ার লেগের দিকে। বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপর ভর করে ব্যাটস-ম্যানের শরীরটা ঘুরে গেছে।

পুলও অনেকটা একই ধরনের মার। ডান পা এবারও অফের দিকে একেবারে বলের লাইনের বাইরে সরে যাবে। আর বলটা যখন ব্যাটসম্যানের পায়ের টো-এর কাছাকাছি আসবে, তখন ঘর ঝাঁট দেবার মতো করে ব্যাট চালাতে হবে। এবারও বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপর ভর করে ব্যাটসম্যানের শরীরটা ঘুরে যাবে।

হুক কিংবা পুল করতে হলে ব্যাটসম্যানকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে আর সময় সম্বন্ধে থাকতে হবে সাবধান। কারণ, একটু এদিকওদিক হলেই বলটা

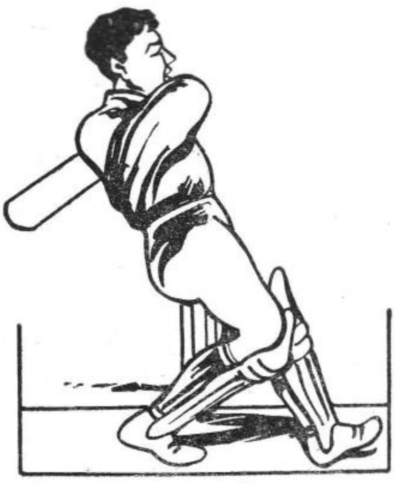

২ নং ছবি

ফস্কে যাবার সম্ভাবনা। হুকের বেলায় তো ব্যাটস-ম্যানের গায়ে আঘাতই লেগে যেতে পারে।

ব্যাটসম্যানকে আগেই দেখে নিতে হবে, লেগের দিকে কত জন ফিল্ডার আছে এবং অন্যরা কে কোথায় আছে। সেই বুঝে বল উঁচু করে কিংবা নীচু করে মারবে ব্যাটসম্যান। তা ছাড়া সময়ের গোলমাল হলে ক্যাচও উঠে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

বাপ্তা যখন একদিনেই হুক আর পুল করতে শিখে গেছে, তখন মনে হয় সকলেই খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করে নিতে পারবে এই মার দুটির কায়দা। আর যাই হোক, হুক আর পুল মোটেই কঠিন নয়। কদিন একটু প্রাকটিস করলেই হলো।

খেলার আসর

আমাদের পাড়ার গলিতে ক্রিকেট খেলা জমে উঠেছে। চারদিকে এখন শুধু ক্রিকেট আর ক্রিকেট।

অস্ট্রেলিয়ায় আরম্ভ হয়ে গেছে ইংলণ্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট লড়াই। এবার কে জিতবে—ইংলণ্ড না অস্ট্রেলিয়া?

ক্রিকেটকে ঘিরে কলকাতাও এখন সরগরম। ময়দানে প্রীতি ও লীগ ক্রিকেটের পাশেই ইডেনে আরম্ভ হয়ে গেছে রণজি ট্রফির খেলা। ইডেন উদ্যানে গেলে কিন্তু এখন রীতিমত মন খারাপ হয়ে যায়। সমস্ত ইডেন উদ্যান এখন ক্ষতবিক্ষত। ফুটবল খেলার ঘা এখনো ইডেনের বুক থেকে শুকিয়ে যায় নি।

বোম্বাইয়ে শুরু হয়ে গেছে এবারের রোভার্স কাপের খেলা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট

৪০টি দল এবারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিয়েছে। গত বছরের বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল আর রানার্স আপ মোহনবাগানও আছে প্রতিযোগীদের তালিকায়। কলকাতার এই দুটি দলকে দু দিকে রাখা হয়েছে। বলা যায় না, এবারও হয়ত রোভার্স কাপের ফাইনালে কলকাতারই এই দুটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে।

তবে ভারতের সেরা খেলোয়াড়রা এবার আর কোন দলেই থাকছেন না। এশীয় ক্রীড়ায় ভারতীয় ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে তাঁরা চলে যাচ্ছেন ব্যাংককে।

ক্রীড়াজগতের সকলেরই নজর এখন ব্যাংককের ওপর। ব্যাংককে এশীয় ক্রীড়া শুরু হলো বলে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতও যোগ দেবে। হকি খেলায় ভারত এবারও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করতে পারবে কিনা কে জানে। ১৯৭২ সালে মিউনিক অলিম্পিকের আগে এবারের এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের মূল্য খুব বেশী। এবারের এশীয় ক্রীড়ায় চলবে অলিম্পিকের প্রস্তুতি।

ভারত থেকে এবার তাই বেশ বড়গোছের দল ব্যাংককে যাচ্ছে। মনে হয়, হকি ছাড়া কুস্তি, এ্যাথলেটিক, ভারোত্তোলন প্রভৃতি বিভাগে ভারত বেশ কয়েকটা পদক পাবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত।

মনে রাখার মতো ঘটনা

পোশাকী ভাল নাম উমেশ মজুমদার। কিন্তু ও নামে কেউ কোন দিন তাঁকে চিনতেও পারবেন না। দুখীরাম মজুমদার নামেই তিনি ছিলেন পরিচিত। আর তাঁর আসল পরিচয় কলকাতা ময়দানের স্যার হিসেবে। স্যার ছিলেন অতি সাধারণ ধরনের সাদাসিদে মানুষ। মাথায় সোলার টুপি, ফুল কিংবা হাফ-হাতা জামা, ঢিলে প্যান্ট, পায়ে কেড্‌স্ আর হাতে ছাতা।

কলকাতা ময়দানের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। আর জহুরীর মতো খুঁজে খুঁজে আনতেন সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড়দের। ছোনে মজুমদার, সামাদ, করুণা ভট্টাচার্য, পূর্ণ দাস, সূর্য চক্রবর্তী, বলাই চ্যাটার্জী প্রভৃতি খেলোয়াড়রা তাঁরই আবিষ্কার।

এরিয়ান ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাকে তখন মস্ত বড় করে ফেলেছেন। এরিয়ান তখন সমানে সমানে পাল্লা দেয় গোরা আর সাহেবী দলগুলোর সঙ্গে। কিন্তু তাহলে হবে কি? স্যার নতুন নতুন খেলোয়াড় খুঁজে আনেন। কিন্তু তারা একটু নাম করার পরই অন্য ক্লাবে চলে যায়। স্যার দুঃখ পান ঠিকই, কিন্তু আবার বেরোন খেলোয়াড় খুঁজতে। আনেনও ঠিক।

নিজের ক্লাবকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সে ভালোবাসার পরিমাপ করা যায় না। নিজের ঐ ক্লাব ও খেলাধুলোর জন্য তিনি যে প্রাণ দিতেও পেছ্‌পা হতেন না, নীচের ঘটনাটাই তার প্রমাণ।

১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে দুখীরামবাবু মারা যান। মারা যাবার কিছু দিন আগে প্লুরিসি হওয়ায় তাঁকে চেঞ্জে পাঠানো হলো দেওঘরে। সেখানে বেশ ভালোই ছিলেন তিনি। শরীরও সারছিল।

কিন্তু দেখতে দেখতে এদিকে কলকাতার ফুটবল মরশুম এসে গেল। দুখীরামবাবু আসতে চান কলকাতায়। তিনি না থাকলে তাঁর এরিয়ান ক্লাব খেলবে কি করে? তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, অনেক বুঝিয়েসুজিয়ে তাঁরা ধরে রাখেন তাঁকে।

কিন্তু এরিয়ান ক্লাব ইতিমধ্যে পর পর কটা খেলায় হারলো। এবার আর কার সাধ্য ধরে রাখে দুখীরাম বাবুকে! তিনি ছুটে এলেন কলকাতায়। সোজা গিয়ে হাজির হলেন মাঠে।

তাঁকে দেখে সবাই তো হতবাক। কি সর্বনাশ! ঐ রকম অসুস্থ শরীর নিয়ে কেউ মাঠে আসে নাকি! একজন তো জিজ্ঞেস করেই বসলেন, এ কি স্যার! এই শরীরে আপনি কেন চলে এলেন?'

স্যার তখন রাগে, দুঃখে আর ক্ষোভে কাঁপছেন। বললেন, 'আসবো না? তোরা বলছিস কি! এরিয়ান হারছে আর আমি কিনা শরীর সারাবার নাম করে দেওঘরে পড়ে থাকবো?'

তারপরই শুরু হলো তাঁর ছোটাছুটি। খেলোয়াড়সংগ্রহ, ঠিকমতো অনুশীলন, দল-গঠন—অর্থাৎ সবই চললো আগের মতো।

কিন্তু শরীরটা যে আর আগের মতো নেই, এ কথা যেন খেয়ালই নেই তাঁর। এরিয়ানকে ওঠাতে গিয়ে তিনি আবার শুয়ে পড়লেন বিছানায়। শেষ চেষ্টা হিসেবে তাঁকে এবার পাঠানো হলো পুরীতে। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। ক্লাব-ক্লাব করে নিজেকে একেবারে শেষ করে ফেলেছেন দুখীরাম মজুমদার।

শেষ সময় তাঁকে ফিরিয়ে আনা হলো কলকাতায়। আর কলকাতাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসের কোন এক দিন।

সওয়াল-জবাব

বাণী মৌলিক

জয়ন্ত বসু, কলিকাতা-১৪

—আমার বন্ধুদের মধ্যে যারা অন্য একটা মাসিক পত্র বেশী পছন্দ করে, এবার দেখছি সে পছন্দটা 'কিশোর ভারতী'র উপর পড়েছে, এবং শারদীয়া সংখ্যা কেনার জন্য ও গ্রাহক হওয়ার জন্য ব্যস্ততাও লক্ষ্য করেছি। এজন্য 'কিশোর ভারতী'কে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ। সত্যি সত্যি যে আমাদের 'কিশোর ভারতী' এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এ চিন্তা করে আমার মন আজ গর্বে ফুলে উঠছে।

ঃ কিশোর ভারতীর এই জনপ্রিয়তার উৎস কিন্তু তোমরাই। কারণ কিশোর ভারতী যে 'গাহে তব জয়গাথা।'

বিকাশচন্দ্র ঘোষ, পাড়া, পুরুলিয়া

—কিশোর ভারতীতে গত কয়েকটি সংখ্যা থেকে দেখছি, কিশোর ভারতীর ঠিকানা দেওয়া হয়েছে 'পত্র-ভারতী'...। এখানে 'কিশোর ভারতী'র নামের পরিবর্তে 'পত্র-ভারতী' লেখার কারণ কি?

ঃ 'পত্র-ভারতী' হল সেই প্রতিষ্ঠানের নাম, 'কিশোর ভারতী' যেখান থেকে প্রকাশিত হয়। 'কিশোর ভারতী' সংক্রান্ত যাবতীয় সব কিছু পাঠাবার ও যোগাযোগ করবার জন্যে তাই 'পত্র-ভারতী'র নাম-ঠিকানা দেওয়া হয়েছে।

অনুপকুমার চৌধুরী, ঢেকো, বাঁকুড়া

—পৃথিবীর কোথায় প্রথম ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবহার শুরু হয়?

ঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। ইলেক্‌ট্রিক কারেন্ট বা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে স্যামুয়েল এফ. বি. মোর্স টেলিগ্রাফ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন এবং ১৮৪৪ খৃীষ্টাব্দে তার উপযোগিতা সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করেন। এই সময় ওয়াশিংটন থেকে অনেক দূরে অবস্থিত বাল্টিমোর পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসানো হয় এবং তাতে সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়।

শিশিরকান্তি রায়নাথ, ডিমডিমা

—বিংশ শতাব্দীর আর এক বিস্ময় সৃষ্টি করল 'শারদীয়া কিশোর ভারতী'। এর অপরূপ মনমাতানো অপূর্ব ও অ-পূর্ব সংকলন দেখে একটা কথাই আমার বলার আছে—

'ভাষা নেই আর হৃদয়ে আমার
আনন্দের ডালি ব্যক্ত করার।'

ঃ হর্ষ-পুলকে উত্তাল তব মন—
সেই তো মোদের সার্থক চাওয়া-পাওয়া।
দিকে দিকে সদা চলে মধু-আহরণ,
সাথী, তব তরে মোদেরই যে গান-গাওয়া।

সুমিত হালদার, কলিকাতা-৯

—উড়ন্ত পিরিচ জিনিসটা কি? এটা কি সত্যিই পৃথিবীর কোন স্থানে দেখা গেছে?

ঃ তোমার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের জবাব আগে দেই। অতীতে বেশ কিছুকাল ধরে জোর গুজব রটছিল যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি উজ্জ্বল এক বস্তুকে মহাকাশ থেকে নেমে আসতে দেখেছে অথবা উড়ে যেতে দেখেছে মহাকাশ-পথে। এই সব 'প্রত্যক্ষদর্শী'র বিবরণ সম্বলিত একাধিক বইও সে সময় বেরিয়েছিল ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। এর ফলে বিজ্ঞানী-মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং জোর অনুসন্ধান শুরু হয়। তথাকথিত 'প্রত্যক্ষদর্শী'দের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টাও বিজ্ঞানীরা বাদ দেন না। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানী-মহল মোটা-মুটি একমত হন যে, গোটা ব্যাপারটাই মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত। তথাকথিত 'প্রত্যক্ষদর্শী'দের বিবরণ অনুসারে উড়ন্ত পিরিচ দেখতে সুবিশাল থালার মত অত্যুজ্জ্বল এক গোলাকার জিনিস যা দ্রুতবেগে আকাশে উড়ে চলে।

অভিজিৎ মুখার্জী, কলিকাতা-৩৪

—যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কি কিশোর ভারতীতে 'ইন্দ্রজিৎ রায় ও ব্ল্যাক ডায়মণ্ড'-এর গল্প ছিল? কিশোর ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত চিত্রকাহিনী 'রহস্যময় সেই বাড়ীটা' নামক গল্পটি পত্রিকার কত সালে কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং কত সালের কোন্ সংখ্যায় শেষ হয়?

ঃ চিত্রে ইন্দ্রজিৎ রায় ও ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের কাহিনী কিশোর ভারতীর গত শারদীয়া (১৩৭৬) সংখ্যায় প্রথম বেরোয়। আর 'রহস্যময় সেই বাড়িটা'-র সূচনা কিশোর ভারতীর এপ্রিল ১৯৭০/ চৈত্র ১৩৭৬ সংখ্যায় এবং তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে রহস্য ক্রমেই যেরকম ঘনীভূত হচ্ছে, তাতে খুব শীগগির ব্যাপারটার এসপার-ওসপার হবে বলে মনে হয় না।

তপন চক্রবর্তী, সোদপুর

—আজ আমাদের নানা হতাশায়, ব্যর্থতায় ভেঙে না পড়ে পথ-পুরুষদের 'বাণী' অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। তাই কিশোর ভারতীর নতুন বছর থেকে প্রত্যেকটি সংখ্যায় 'শাশ্বত বাণী' নামক একটি নতুন বিভাগ যদি থাকে, তবে কেমন হয়?

ঃ কথায় নয় কাজে যাঁরা বড় হয়েছেন, সেইসব মহাজীবনের কাহিনী কিশোর ভারতীতে প্রায় নিয়মিতই দেওয়া হচ্ছে এবং হবে। আমরা চাই, শুধু মনীষীদের বাণী মুখস্থ করা নয়, তাঁদের জীবনের পথ তোমাদের উদ্বুদ্ধ করুক।

তাপসকুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগর

—কিশোর ভারতীর গ্রাহক হতে গেলে কি 'কিশোর ভারতী'র পেছনে যে আবেদনপত্র থাকে তা পূরণ করে খামে করে পাঠাতে হয় এবং একই দিনে মানি অর্ডার করে ৯ টাকা পাঠাতে হয়?

ঃ বিশেষ (শারদীয়া) সংখ্যাটি (রেজিস্ট্রী) ডাকে পেতে হলে নয় টাকার সঙ্গে অতিরিক্ত এক টাকা পাঠাতে হয়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'গ্রাহক-গ্রাহিকা হবার নিয়মাবলী' পড়লে এ সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারবে।

বিষ্ণু রায়, জামসেদপুর

—'কালের জয়ডংকা বাজে' প্রথমেই পড়লাম। ভীষণ ভাল লাগল। আমি মনে করি, যে কোন বয়সের মানুষের ভাল লাগবে। জীবক সর্বকালের আদর্শ চরিত্র। আমরা সবাই যদি জীবক হতাম! 'অপরাধী তুমি নও, অপরাধী আমি'—এসব পড়তে পড়তে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

ঃ ইংরেজীতে একেই বলে—'Tears of ecstasy' অর্থাৎ সীমাহীন আনন্দের অশ্রু!

অতসী গুপ্ত, কৃষ্ণনগর

—কিশোর ভারতীর চাঁদার হার ৯ টাকা তার বিনিময়ে আমরা পাচ্ছি অমূল্য সম্পদ পূজাসংখ্যা যার দাম ৬ টাকা এবং ১১ খানা সাধারণ সংখ্যা যার মোট দাম ৮·২৫ পয়সা। এছাড়া ১১ খানার ডাক খরচ ১·১০ পয়সা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মোট দাম হওয়া উচিত ১৫·৩৫ পয়সা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এত অল্প দামে আপনারা গ্রাহক-গ্রাহিকাদের পত্রিকা পাঠাচ্ছেন শুধু প্রচারের উদ্দেশ্যে। এই অমূল্য সম্পদ পূজা-সংখ্যাখানি বিনামূল্যে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের বিতরণের জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অন্য কোন পত্রিকা ব্যবসায়ী এর বার্ষিক মূল্য ১২ টাকা ধার্য করতেন। এবিষয়ে আপনাদের ও গ্রাহক-গ্রাহিকা সমেত অন্য সকলের মতামত প্রকাশ করলে ভাল হয়।

ঃ তোমার এই অভিমত ও পরামর্শের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। তোমার পরামর্শ শিরোধার্য করে এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মতামতই আহ্বান করছি। আমাদের মত সবার শেষে।

তাপস বসু, বেহালা, কলিকাতা ৩৪

—আমি কিশোর ভারতীর নিয়মিত পাঠক ও প্রতিটি সংখ্যা পড়ি এবং চমৎকার লাগে। শারদীয়া ১৩৭৭ সংখ্যা খুবই ভাল লাগল। বিশেষ করে চিত্রে ডিটেকটিভ গল্পটি।

ঃ আই সি!

কনক মিত্র, কলিকাতা-১৪

—কিশোর ভারতীর পূজা-সংখ্যা পড়ে খুব ভাল লাগল। আমার মতে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত অন্যান্য পূজা-সংখ্যা অপেক্ষা কিশোর ভারতী শীর্ষস্থান অধিকার করার সম্মান লাভ করেছে।

ঃ অর্থাৎ শারদীয়া কিশোর ভারতী (১৩৭৭) শুধু আকারে বৃহত্তমই নয়, প্রকারেও শ্রেষ্ঠতম?

—শারদীয়া কিশোর ভারতীর সওয়াল-জবাবের পাতায় দেখলাম, খাগড়া থেকে সুব্রত মজুমদার কিশোর ভারতীর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার বাড়িয়ে ১২, করতে লিখেছেন। আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কারণ, পত্রিকার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির, বিশেষত কাগজের দাম যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে আমাদের এই কিশোর ভারতী গ্রাহক-গ্রাহিকাকে অত্যধিক সুবিধা দিতে গিয়া বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমাদের পক্ষে সেটা পরিণামে রমণীয় হবে না।

ঃ এ বিষয়ে আমরা অন্য গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পাঠক-পাঠিকাদের মতামত আহ্বান করছি।

সত্যব্রত গুপ্ত, ডিব্রুগড়

—ইংরেজীতে সকাল বেলা দেখা হলে বলে good morning সকাল ৮টা পর্যন্ত। বড় জোর ১০টা। ১১টায় দেখা হলেও ঐ একই কথা বলে কেন?

ঃ বেলা ১১টা কেন, দুপুর ১২টা পর্যন্ত ইংরেজীতে ঐ সম্ভাষণের চল আছে। বেলা ১২টার পরেই শুরু হয় অপরাহ্ণ, তখন ওটা অচল, শুরু হয় good evening।

সেখ আনিসুর রহমান, চিংড়ীপোতা, ২৪ পরগনা

—আমি কিশোর ভারতীর একজন গুণমুগ্ধ পাঠক। কিশোরদের জন্য প্রকাশিত কোন পত্রিকা আমাকে এতটা মুগ্ধ করতে পারেনি। অন্যান্য পত্রিকা থেকে এই পত্রিকার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম। তা হল সুন্দর প্রচ্ছদ, সুন্দর লাইনো টাইপ এবং বিভিন্ন রসগ্রাহী বিভাগ। এত বিভাগ আর কোন পত্রিকায় নাই। কিশোর ভারতীর এই স্বাতন্ত্র্যই আমাকে গ্রাহক করে দিয়েছে। এবারের শারদীয়া সংখ্যার প্রচ্ছদ এবং 'কালের জয়ডংকা বাজে' লেখাটি খুবই ভাল লেগেছে। এতে শিক্ষণীয় বিষয় বহু আছে।

ঃ এজন্য আমরা সবুজ মনের মুখপত্র কিশোর ভারতীর রূপকার হিসেবে নিজেদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করছি।

তাপস বসু, কলিকাতা-৩৪

—কিশোর ভারতীতে যে চিত্রে গোয়েন্দা গল্পটা দিচ্ছেন সেটা খুবই ভাল লাগছে। লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

ঃ শুধু লেখককে? চিত্রশিল্পীকে নয়?

শ্যামলকুমার চক্রবর্তী, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী

—টেনিদা আর নেই। কিশোর সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা অবিস্মরণীয় চরিত্র। এই সাহিত্যিকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যদি কোন সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যায় কিশোর ভারতীতে, তাহলে তার মাধ্যমে তাঁর অমর স্মৃতি তর্পণ করা হবে না কি?

ঃ অত্যন্ত সুচিন্তিত প্রস্তাব। প্রসঙ্গত বলি, টেনিদার কিন্তু মৃত্যু নেই। আর স্রষ্টা চিরকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর এই সৃষ্টির মধ্যে। স্রষ্টার অকাল বিয়োগে তাঁর সৃষ্ট টেনিদার ভবিষ্যৎ কীর্তিকাহিনী আর জানা যাবে না, এই অপূরণীয় ক্ষতিটাই আজ আমাদের স্বীকার করে নিতে হল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটদের জন্যে এক অপরূপ গল্পের মায়াপুরী গড়ে তুলেছেন। তাঁর বিচিত্র বর্ণের ও স্বাদের সব গল্প এসে ভিড় করেছে **এক জাহাজ গল্প** সঙ্কলনে। তিনটি সংগ্রহে ভাগ করা হয়েছে **এক জাহাজ গল্প**-কে। **ময়ূরপঙ্খী, মকরমুখী, সাগরদাঁড়ী**। প্রতি সংগ্রহেরই শেষে আছেন এক ও অদ্বিতীয় সেই মহাপুরুষ, যাঁর অনুপম গুলমিশ্রিত গল্প শোনার পর আর কিছু শোনবার স্পৃহা থাকে না। বহুবর্ণাঢ্য প্রচ্ছদপটে নয়নাভিরাম ও ছোটয়-বড়য় মিলিয়ে প্রায় ডজন তিনেক ছবিতে অলঙ্কৃত প্রতি সংগ্রহের দাম ছয় টাকা॥

● প্রেমেন্দ্র মিত্রের আর কয়েকখানি বই ●

শুক্রে যারা গিয়েছিল [৩·০০] **ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস** [২·২৫]

গল্প আর গল্প [২·২৫]

ভয়ঙ্করের জীবন-কথা

মহাদেশগুলি নাকি পিছলে সরে যাচ্ছে? প্রশান্ত মহাসাগর ঘিরে তাই কি ভয়ঙ্করের মেখলা? ভূমধ্যসাগরের কোথায় সেই নৈসর্গিক বাতিঘর—নিঃশ্বাসে যার আগুন ঝরে? মোরেসবী বন্দরে মহাকায় ব্যাঙের ছাতার আকারে কী লাফিয়ে উঠেছিল আকাশে? এমনি রোমাঞ্চকর সব কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে **ভয়ঙ্করের জীবন-কথা।** অষ্টম শিশু-সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্বর্ধিত এই গ্রন্থের লেখক **দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।** ২·২৫॥

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড॥ কলিকাতা ৯ * ফোন: ৩৪-৩১৫৭